আমার সমাজ

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

শ্রী আনন্দমিত্র মহাস্থবির

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

আমার সমাজ

বঙ্গীয় বিদ্যোৎ-সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধ দর্শন সমন্বয়ে তুলনামূলক মীমাংসা ও দুঃখ-ধ্বংস-মূলক গভীর দর্শনের পরিবেশনে- "সত্য দর্শন" গ্রন্থ প্রণেতা **শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির** মহোদয়ের জ্ঞান-গর্ভ ভূমিকা সম্বলিত।

শ্রী আনন্দমিত্র মহাস্থবির
প্রণীত

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
পশ্চিম আধার মানিক
রাউজান, চট্টগ্রাম।

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী গ্রন্থমালা-৮

পশ্চিম আধার মানিক নিবাসী

শ্রীযুত সুরেন্দ্র কুমার বড়ুয়া

এসিস্‌টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, পি. ডব্‌লিউ. ডি.

মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী **শ্রীযুক্তা প্রিয়রমা বড়ুয়ার**

অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ

২৫০০ বুদ্ধাব্দ

বাংলাদেশ সংস্করণ ঃ

২৫৫০ বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত।

১৪১৩ বাংলা

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ

সম্পাদনায় ঃ

ভদন্ত বিপুল বংশ ভিক্ষু

প্রতিষ্ঠাতা

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

আবাসিক

শ্মশান ভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার

মোগলটুলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

সহযোগিতায় ঃ

ভদন্ত ত্রিলোকাবংশ ভিক্ষু

পরিচালক ঃ শ্মশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার

ভদন্ত সংঘরত্ন ভিক্ষু

আবাসিক ঃ শ্মশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

বাবু আনন্দ মোহন বড়ুয়া

বরদা মহাজনের বাড়ী

পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ সম্পাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

শ্রদ্ধাদান ঃ .....

উৎসর্গ

সমাজের মঙ্গলকামী
সমাজ-সংস্কারক
ভিক্ষু ও গৃহীদের
করকমলে।

-গ্রন্থকার

সমর্পণ

পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের সূর্য সন্তান
বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার ২৫তম
মহামান্য সংঘনায়ক "সদ্ধর্ম শ্রী"
পণ্ডিত প্রবর প্রয়াত
ভদন্ত জ্ঞানালোক মহাথেরো
মহোদয়ের পূণ্য স্মৃতি স্মরণে
অত্র গ্রন্থের বাংলাদেশ সংস্করণ
সমর্পণ করিলাম।

-সম্পাদক

ANANDA VIHAR

SANGHANAYAKA ANANDAMITRA MEMORIAL & CULTURAL CENTRE

BUDDHA PARITTA NAGAR, NO. 4, P. O. - BODH GAYA - 824 231
DIST. - GAYA, BIHAR, INDIA
Tel. : 091-0631-2201115 Fax : 91-0631-2201963
E-mail : anandavihar@rediffmail.com

PATRONIZERS :

Sangharaj Pragya Jyoti Mahathera

Sanghanayaka Dharma Pala Mahathera

Ven. Dr. Rastra Pala Mahathera
President, I.M.C.

Rev. Phra. Bodhnaik Saphan
Lord Abbot, W.T.

Rev. Acharya Bhikkhu Karuna Shastri
Gl. Secretary, I.B.M.

Dr. Revata Thera
Gl. Secretary, M.S.J.

Mr. Arunabe Barua
Justice, H.C., Kolkata

Dr. Dipak Kumar Baura
Member of Minority Commission (W.B.)

GOVERNING BODY

President :
Ven. Bi. Ananda Bhikkhu

Vice-President :
Mr. Sankar Pratim Barua

Secretary :
Mr. Pranab Kumar Barua

Asst. Secretary :
Mr. Ashok Barua

Treasurer :
Mrs. Sangeeta Barua

Executive Members :
Mr. Prabal Kumar Barua
Mr. Subrata Baura
Mr. Manik Dey
Mr. Babul Chowdhury

Registered Office :
BUDDHA PALLI
Manicktala, P.O. Ichapur
Nawabganj, 24 Parganas (N)
WEST BENGAL
Pin - 743144
Phone : 033-25616014

Ref. No. [illegible]

Date. ১৮-০২-২০০৮

সভাপতি/সম্পাদক
আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী
পরিচয় ভাবীর ভাগিনা, মুক্তিকাল, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মহাশয়,

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ আপনাদের প্রকাশিত কর্ম জানাচ্ছি যে, গত ১০-০১-০৮ তারিখ লিখিত আপনাদের এক পত্রের মাধ্যমে আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী কর্তৃক প্রদত্ত সংঘনায়ক আনন্দমিত্র মহাস্থবির প্রণীত পুস্তকাবলী বাংলাদেশে পুনঃ প্রকাশ করার ঐ পরিকল্পনায় কথা জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলাম। উল্লেখ্য, সংঘনায়ক আনন্দমিত্র মহাস্থবির মহোদয়ের সকল দায়াদের সর্বাধিকারী সংঘনায়ক আনন্দমিত্র বোদ্ধবিহার এবং কার্যালয় ট্রাস্টের (বুড়িমা, বাংলা) এর অনুমতিক্রমে আপনাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

আপনাদের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১৪-০১-০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সংঘনায়ক আনন্দমিত্র মেমোরিয়াল এন্ড কালচারাল সেন্টার এর এক আলোচনা সভায় আপনাদের পরিকল্পনাকে অনুমোদন দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে আর উল্লেখ্য যে, আপনাদের প্রকাশনী ব্যতীত অন্যকোন প্রকাশনী বা সংস্থাকে কখনোই অনুমোদন দেয়া হবে না। অবশ্যই যে পুস্তকাবলীর কোন প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করা বাঞ্ছনীয় এবং প্রকাশনা সংখ্যার কম, প্রকাশের স্থান ও তারিখ প্রকাশিতব্য। পরিশেষে আপনাদের উক্ত পরিকল্পনার সফলতা কামনা করি।

ইতি

(প্রেম আনন্দ ভিক্ষু)
সভাপতি
SANGHANAYAKA ANANDA MITRA MEMORIAL & CULTURAL CENTRE

(প্রণব কুমার বড়ুয়া)
সাধারণ সম্পাদক
General Secretary
Sanghanayaka Ananda Mitra Memorial & Cultural Centre

আমার দু'টি কথা

মেঘবারি সর্বভূতে, বর্ষণকারী ধর্মমেঘে;
ত্রি-লোক শান্তি সুখকারী, প্রণমি সেই বুদ্ধে।

যে দিন থেকে "আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী'র" কার্যক্রম শুরু হয়, তখন থেকে বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ী ভিক্ষু সংঘ ও উপাসক / উপাসিকাদের পক্ষ থেকে বারংবার অনুরোধ আসতে লাগল ; পরম শ্রদ্ধেয় মহামান্য সংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো মহোদয়ের রচিত "আমার সমাজ" নামক মূল্যবান গ্রন্থটি পুনঃ মুদ্রণ করা হোক। ইতোমধ্যে অত্র প্রকাশনী হতে আনন্দমিত্র মহাথেরো ও অন্যান্য বেশ কয়েকজন লেখকের সর্বমোট ৭টি গ্রন্থ প্রকাশ করি। আমারও দৃঢ় সংকল্প ছিল "আমার সমাজ" গ্রন্থটি শীঘ্রই পুনঃ মুদ্রণ করার। চলতি বছরের শুরুর দিকে "আমার সমাজ" গ্রন্থটির পুনঃ মুদ্রণের কাজ এক প্রকার আরম্ভ করি। কিন্তু মাঝখানে মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত ২৫৫০ বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভারতে যাত্রা এবং শ্রীলংকার ভিক্ষুদের সাথে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র বুদ্ধগয়ার মূল বোধিবৃক্ষের নীচে এক মাস ব্যাপী সূত্র পাঠে অংশ গ্রহণ এবং কলিকাতায় কোমরের চিকিৎসা সম্পন্ন করে দেশে ফিরি। তারপর মহাচুলালংকরন রাজা বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ইউনাইটেড ন্যাশনাল বেশাখ ডে উপলক্ষে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে মহামণ্ডল কল্যাণ-সংস্থা বাংলাদেশ (M. W. O) এর সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় গুরু ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর নেতৃত্বে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং দেশে ফিরে পুনরায় ভারতে চিকিৎসার জন্য গমন। চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে কিছুদিন পর "আমার সমাজ" গ্রন্থটি পুনঃ মুদ্রণের কাজ শুরু করি। গ্রন্থটি প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি একান্ত দুঃখ প্রকাশ করছি।

"আমার সমাজ" নামক গ্রন্থটি পুনঃ মুদ্রণের জন্য এত অনুরোধ কেন এই বিষয়টি আমাকে বেশ চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল। অত্র গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে, আজ থেকে প্রায় অর্ধশত বছর পূর্বে। মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগলো অর্ধশত বছর পূর্বে বর্তমান বড়ুয়া সমাজ কেমন ছিল? বইটিতে

যখন চোখ বুলাতে লাগলাম তখনকার বড়ুয়া সমাজের চিত্র চোখের মধ্যে ভেসে উঠল। তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে, তখনকার সমাজ ব্যবস্থা ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন নেই বললেই চলে। অত্র গ্রন্থের এক পঙক্তিতে লেখক উল্লেখ করেছেন-"সমাজে এমন হীন নিন্দুক কেহ কেহ আছে যাহারা প্রব্রজ্যা-জীবনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং এই শ্রেষ্ঠ জীবনকে বরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহারা বলে যে খাইতে না পাইয়া পেটের দায়ে ভিক্ষু হইয়াছে। অন্য কেহ বলে যে স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইতে না পারিয়া সংসার ত্যাগী হইয়াছে আর কেহ বলে যে উপরে সাধুবেশ ভিতরে সব শয়তানী ইত্যাদি।" সেকালের এই হীন ধ্যান-ধারণা থেকে বর্তমান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা মুক্ত হতে পেরেছে কি? কিছু কিছু মানুষ মুক্ত হতে পারলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুক্ত হতে পারেনি। তাদের সেই চিন্তা যদি সত্য কথন হয়। তাহলে সেদিন কেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ বিশাল কপিলাবস্তু রাজ্যের চক্রবর্ত্তী রাজা হবার সৌভাগ্য থাকার পরও কেন গেরুয়া বসন ধারী সন্ন্যাসী হয়ে বন জঙ্গলে অকল্পনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করলেন! জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু থাকলে মনের মধ্যে এই হীন চিন্তা লালন করা যায়। নিজ ধর্মগুরুদের প্রতি যারা এই হীন চিন্তা পোষণ করে; আসলে কি তারা মানুষ না অন্য কিছু? বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয় শান্তিতে ধর্ম অনুশীলন করার জন্য। বিহার আবার উৎসর্গ করা হয় সংঘের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পরিচালনা কমিটি একটা গঠন করে বিহারের দাবিদার হয়ে যায় তারা। ভিক্ষু সেখানে দারোয়ান বিশেষ। এটা হবার কারণ কি? দিবারাত্রি যিনি বুদ্ধ মূর্তি ও বিহার দেখাশোনা করেন তাঁর কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে না। আর যারা পঞ্চশীল পালন পর্যন্ত করেনা তারা বিহারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়। এইসব অহেতু কার্যগুলো পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিহার সংঘ সম্পত্তি। সংঘই বিহারে সমস্ত কার্য পরিচালনা করার একমাত্র দাবিদার। কারণ দান করা বস্তুর উপর কাহারো হস্তক্ষেপ চলে না। দুই পক্ষ এক না হলে সুন্দর কিছু যেমন আশা করা যায় না ; ঠিক তেমনি ভিক্ষু সংঘ ও গৃহী সংঘের মধ্যে যৌথ সমন্বয় না হলে শাসন সদ্ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় উন্নতির চরম শিকড়ে পৌঁছতে পারবে না। ভিক্ষু সংঘ না থাকলে যেমন সদ্ধর্ম টিকে থাকা সম্ভব নয়, আবার গৃহী সমাজ ছাড়া ভিক্ষু সংঘ কোন দিন রক্ষিত হতে পারে না। একে অপরের প্রতি ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার না করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবস্থান করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করাই হচ্ছে বর্তমান সময়ে টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

পরিশেষে বলব সকলের শুভবুদ্ধি উদয় হোক। সত্য পথে পদাচরণ করে সকলে নিজ নিজ জীবনকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করি। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও কল্যাণ মিত্র উপাসক / উপাসিকাগণ অত্র গ্রন্থটি পুনঃ মুদ্রণের জন্য শ্রদ্ধাদান দিয়ে বিশেষভাবে উপকার করেছেন। আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর একান্ত আশীর্বাদ ও যাঁদের আন্তরিক ভালবাসা ও অনুপ্রেরণায় আমি দীর্ঘপথ পরিক্রমায় সামনের দিকে অগ্রসর হবার সুযোগ পেয়েছি তাঁরা হলেন-কল্যাণমিত্র ভদন্ত তিলোকাবংশ ভিক্ষু, সংঘরত্ন ভিক্ষু, শ্রদ্ধাপাল ভিক্ষু, মৈত্রীবংশ ভিক্ষু, শুভানুধ্যায়ী বাবু ডালিম বড়ুয়া, বাবু মিলন বড়ুয়া, বাবু সুমন বড়ুয়া, বাবু রাজীব বড়ুয়া, বাবু উদয় শংকর বড়ুয়া (বাবু), বাবু এ্যাপোলো বড়ুয়া (নিশাত), বাবু হিরো বড়ুয়া (জনি), বাবু রাহুল বড়ুয়া প্রমুখ।

আরো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সতীশ চন্দ্র গ্রন্থালয় এর স্বত্বাধিকারী বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়াকে যার বিজ্ঞ সচেতনতার দ্বারা দীর্ঘ অর্ধশত বছর পূর্বে প্রকাশিত বইটি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থালয়ে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করে রাখার প্রেক্ষিতে আজ নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে পারলাম।

বাবু আনন্দমোহন বড়ুয়া সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে অনেক পরিশ্রম থেকে বাঁচালো। আমি তার মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি।

সকলের জয় মঙ্গল হোক।

ইতি

বিপুলবংশ ভিক্ষু

প্রতিষ্ঠাতা

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

আবাসিক

শ্মশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার

মোগলটুলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

২৫৫০

বুদ্ধ জয়ন্তী বর্ষ

৭, আগষ্ট ২০০৬ ইং

বিষয় সূচী

১। ভিক্ষু ও বড়ুয়া-বৌদ্ধ-পৃঃ ১-

মনুষ্য জন্মের দুর্লভতা। পশু হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠতার কারণ ; অভিমত। জীবন যাপনের দুইটি পথ। দুঃশীল ভিক্ষুও শীলবান গৃহী হইতে শ্রেষ্ঠ ; ১ম প্রমাণ, ২য় প্রমাণ, দেবদত্তের কৃতকর্ম ; অভিমত। সাধুর লোকনিন্দা উপেক্ষনীয় ; পাপ করার চেয়ে ধর্মের ছলনাও ভাল ; ভিক্ষুরা গৃহী হইতে অধিকতর পাপী ধারণা ; অভিমত। লোথকের পুত্রেরা অন্য গৃহীর পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ ; অভিমত। বড়ুয়া-সমাজের অবনতির শ্রেষ্ঠ কারণ। শিক্ষিত হইলেই জ্ঞানী হয় না ; জ্ঞান শব্দের ব্যাখ্যা ; বুদ্ধ কাহাকে জ্ঞানী বলিয়াছেন। চতুর্বিধ ভিক্ষু ও সাধক ভিক্ষুর প্রভাব ; ত্রিবিধ প্রচার ও নীরব ভাষায় প্রচারের প্রভাব। শিক্ষক-ভিক্ষুর প্রয়োজনীয়তা ও অভাবে ক্ষতি। সমাজ-রক্ষক ভিক্ষুর প্রয়োজনীয়তা ও অভাবে ক্ষতি। বর্তমানে সমাজ রক্ষক ভিক্ষুরও অভাব ; ভিক্ষু না হওয়ার কারণ ; ভিক্ষু-জীবন একটি ব্যবসায় মাত্র। ভিক্ষুরা সমাজের পরগাছা। ওয়া-খরচ গ্রহণ ও বাড়ীতে সাহায্যের কারণ। ভিক্ষুর উপকারের প্রত্যুপকার অসম্ভব ; ১ম প্রমাণ, ২য় প্রমাণ, ৩য় প্রমাণ, ৪র্থ প্রমাণ, অভিমত, ৫ম প্রমাণ, অভিমত ; ৬ষ্ঠ প্রমাণ, অভিমত। ভিক্ষুর বিরুদ্ধাচরণে মহাপাপ ; অগ্নি সূত্রের আংশিক ব্যাখ্যা ; "ন উঞ্‌ঞাতব্ব" সূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ; ভিক্ষু-নিন্দুকের দুঃখ-দুর্দ্দশা। ভিক্ষু ও পুরোহিত ; পুরোহিত শব্দের অর্থ ; পুরোহিতের অত্যাচার। ধর্ম-পূজা ; ধর্ম-পূজায় গৃহী ও ভিক্ষুর মঙ্গল। বড়ুয়া-সমাজ জ্ঞান ও গুণের সম্মান ও মর্যাদা দিতে জানে না ; ধর্ম-পূজার প্রচলন ও সমাজে গণ্ডগোল।

২। দায়ক-পৃঃ

ধর্ম-যাজকের প্রয়োজনীয়তা ; দায়ক ও কৃত্য। বড়ুয়া-সমাজে ভিক্ষু নিমন্ত্রণের কারণ ; ভিক্ষুর আহারের ব্যবস্থা। সমাজে প্রচলিত দায়ক ও থাগা। নিমন্ত্রিত ভিক্ষুদের প্রতি তথা কথিত দায়কের ব্যবহার ; চণ্ডাল হইতে অধম দায়ক ; ধনীরা দায়ক হিসাবে দরিদ্র হইতে হীন ; নিমন্ত্রিত ভিক্ষুর প্রতি

শ্রদ্ধা- অশ্রদ্ধা ; বিহারে থাকিতে দিবার বা না দিবার অধিকার দায়কের নাই। দায়ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হেতু গৃহীদের মধ্যে বিভেদের ভ্রান্ত ধারণা ; সকলেই সকল ভিক্ষুর দায়ক। ভ্রান্ত ধারণায় সমাজের ক্ষতি। দায়কের প্রকার ভেদ ; সাধারণ দায়ক ; বিশিষ্ট দায়ক ; বিশিষ্ট দায়কের শ্রেণীভাগ। দায়ক গ্রহণে সাবধানতা ; দায়ক হইবার অধিকারী। ভেদজ্ঞানে সমাজের অমঙ্গল ধারণা ; সমদৃষ্টি। দায়কের জীবন ধন্য ; বার্মা দেশের দায়ক ; ১ম উদাহরণ, ২য় উদাহরণ, ৩য় উদাহরণ ; অতীতের উদাহরণ। বিশিষ্ট দায়কের ইহলোকিক ফল ; সাধক ভিক্ষুর দায়কের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ; প্রচারক ভিক্ষুর দায়কের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ; শিক্ষক ভিক্ষুর দায়কের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ; সমাজ রক্ষক ভিক্ষুর দায়কের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ; দায়কের জন্ম-জন্মান্তরের ফল।

৩। বিহার দায়ক-পৃঃ

সাধারণ বিহার দায়ক ; বিশিষ্ট বিহার দায়ক। বিশিষ্ট দায়ক কর্তৃক দেশের উন্নতি সাধন ; বিশিষ্ট দায়কের অভাবে গ্রামবাসীর দুর্নাম। প্রব্রজিত শূন্যস্থানের অমঙ্গল। দেবগণ কর্তৃক দায়কদিগের মঙ্গল। বিহারদায়ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও গ্রামের ক্ষতি। কিরূপে বিহার-দায়কের পাপ হয় ; বিহার সম্পত্তি হরণকারী দায়ক নয় চোর মাত্র। বিশিষ্ট বিহার দায়কের প্রত্যক্ষ ফল। বিহার-দায়কের জন্মান্তরের ফল। বেলাম সূত্রের আংশিক ব্যাখ্যা।

৪। গ্রাম্য-সমাজ-পৃঃ

গ্রাম্য সমাজ ও উদ্দেশ্য। শিরায় বসিয়া শ্রেষ্ঠতা অর্জন। সংঘের আদর্শ গ্রহণ। অতীত ও বর্তমান সমাজ ; সমাজ নেতাদের পাপ-কর্ম। সমাজ নেতাদের অজ্ঞানতাপূর্ণ বিচার ও নিজেদের শাস্তি ; জ্ঞানপূর্ণ শাস্তি ও নিজেদের অব্যাহতি। ভিক্ষুদ্বারা সমাজ শাসন। সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে গ্রামের অবনতি। অশিক্ষিত ও অসভ্যদের সমাজ। নানা প্রকার সমাজের প্রয়োজনীয়তা।

বক্তব্য

আমি ছাত্র-জীবনে আমাদের গ্রাম্য বিহারে একাকী থাকিয়াই অধ্যয়ন করিয়াছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে "রত্নমালা'র সাহায্যে ধর্মময় জীবন গঠনে চেষ্টা করিয়াছি। সেই চেষ্টার দ্বারা সেই সময়েই ধর্মের স্বাদ কিছু কিছু অনুভব করি। আমি মাতাপিতার এক পুত্র সন্তান হইলেও সেই অনুভূত ধর্মরসই আমাকে যৌবনের গোড়াতে প্রব্রজিত হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রব্রজিত হইয়া মনোমত ধর্মের বা জ্ঞানের সাধনা করিতে না পারিয়া পূর্বলব্ধ ধর্মীয় সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করতঃ ছয় বৎসর শ্মশানে ও জঙ্গলে কাটাই। তাহাতে যে সুখ ও জ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি ইচ্ছা হইয়াছিল তাহা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে ছাপাইয়া অন্য সকলকে পরিবেশন করি। এ বিষয় নিয়া মধ্যে মধ্যে ধর্মদেশনা করিয়াছি। ইহাতে অনুভব করিয়াছি যে অতি অল্প সংখ্যক নরনারীই উহা আয়ত্ত করিতে পারেন ; ইহাতে আমার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সাময়িকভাবে শান্ত হয়।

এই সমাজে নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত খাইয়া ও বহুদিন সমাজের মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং ধর্মদেশনা করিয়া তাহাতে আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, আমার ধারণা হইয়াছে যে সমাজের দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়া পরিবারের ও সমাজের উন্নতিমূলক ধর্মদেশনা না করিলে শুধু দান, পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও জাতকাদি দেশনায় সমাজের যথাযথ কল্যাণ হইবে না। শরীরে রোগ থাকিলে রাশি রাশি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর বস্তু ভোগ করিলে যেমন শরীর সুস্থ সবল হইতে পারে না সেইরূপ সমাজের দোষ ত্রুটি বিদূরিত না করিয়া অমৃতময় ধর্মদেশনা করিলেও সমাজ সমুন্নত হইতে পারে না। সুদক্ষ ভিষক যেমন দুর্বল দেহকে সবল করিতে গিয়া দেহটীর সুস্থ সবল অংশের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া রোগাক্রান্ত ও দুর্বল অংশের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং রোগ বিদূরিত করিয়া সেই দুর্বল অংশের সবলতার সঙ্গে সঙ্গে দেহকেও সুস্থ, সবল ও সমুন্নত করেন সেইরূপ সমাজ-দেহকে সুস্থ, সবল ও সমুন্নত করিতে হইলে সমাজ-দেহে যেইরূপ দোষ-ত্রুটি আছে, সেইগুলিকে আগে বিদূরিত করিতে হইবে। উহা বিদূরিত হইলে সমাজ অনায়াসে সুস্থ, সবল ও সমুন্নত হইবে যেমন রোগ বিদূরিত হইলে ডাল-ভাতে ও শরীর সুস্থ, সবল ও সমুন্নত

হয়। দক্ষ শিক্ষক যেমন ছাত্র যেই বিষয়ে দুর্বল সেই বিষয় শিক্ষা দিয়া তাহাকে সবল করে, সেইরূপ যে সব দোষে সমাজ অনুন্নত সেই সব দোষ দেখাইয়া উহা বিদূরিত করিতে সমাজকে শিক্ষা না দিলে সমাজ কখনও উন্নত হইতে পারিবে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই আমি সময় সময় স্থানে স্থানে ঐ ভাবের ধর্ম-দেশনা করিয়াছি এবং শ্রোতাদের শ্রবণের আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং ইহাতে যে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইতেছে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

এক সময় রাঙ্গুনিয়া ভিক্ষু সমিতির সম্পাদক, ঘাটচেক ধর্মামৃত বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সুগত বংশ স্থবির আমাকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে আমি যেন ভিক্ষু ও গৃহীকে অবলম্বন করিয়া সমাজের হিতমূলক কিছু লিখি। তাঁহারই অনুরোধে এই পুস্তিকা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ না হইলে আমি হয়তঃ এই কাজে এখন হস্তক্ষেপ করিতাম না। চট্টগ্রাম প্রবর্তক প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত হরিনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়, আধার মানিক গ্রাম নিবাসী ডাঃ প্যারীমোহন বড়ুয়া, শ্রীযুত যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়া (হোমিওপ্যাথ), বি.এস.সি পরীক্ষার্থী শ্রীমান সুনীল কুমার বড়ুয়া এবং অন্যান্য যাঁহারা এই পুস্তিকার মুদ্রণ, পাণ্ডুলিপি তৈরী এবং প্রুফাদি সংশোধনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দৈহিক ও বাচনিক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং তজ্জন্য তাঁহাদের ক্রমিক উন্নততর জীবন কামনা করি।

চট্টগ্রামের ভিক্ষুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী মহাপণ্ডিত "সত্য-দর্শন" প্রণেতা পূজনীয় শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির এই পুস্তিকাটির পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার গৌরব বর্ধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ এবং তাঁহার গভীর স্নেহের জন্য তাঁহার চরণতলে আমার ভক্তি অর্ঘ নিরন্তর নিবেদিত।

এই পুস্তিকা প্রণয়নে আমি যেই সব সূত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছি। পূজনীয় রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবিরের "মহাপরিনিব্বান সুত্তং" হইতে একটু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী। যাহাতে সর্বসাধারণ বুঝিতে সক্ষম হয় তেমন সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা ইহাতে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সর্বসাধারণ যথাসত্য বুঝিয়া সমাজের দোষ-ত্রুটি বর্জন করতঃ সমাজকে সমুন্নত ও নিজেকে সুখী করিতে পারিলেই আমার শ্রম ও এই অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তক প্রনয়ণে পশ্চিম আধার মানিক গ্রাম নিবাসী সেন্ট্রাল পি. ডব্লিও. ডি'র এস. ডি. ও. শ্রীযুত সুরেন্দ্র কুমার বড়ুয়া মহোদয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা প্রিয়রমা বড়ুয়া যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন এবং বিধ্বস্ত সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি তাঁহার সর্বতোমুখী মঙ্গল কামনা করিতেছি। এই পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সদ্ধর্ম প্রচার কার্যে ব্যয়িত হইবে।

নানা কারণবশতঃ এই পুস্তিকার অনেকস্থানে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। উহাদের যেই শব্দগুলি অর্থ বিকৃত করিয়াছে শুধু সেই শব্দগুলি শুদ্ধি-পত্রে দেওয়া হইয়াছে। আশা করি পাঠকবর্গ এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া মূল বক্তব্যগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। ইতি-

গ্রন্থাকার

ফারাচিং বিহার,
বাগোয়ান
১৮/৪/৫৪ ইংরেজী।

ভূমিকা

এই পুস্তকখানি কোন ধর্মীয় পুস্তক না হইলেও ধর্মের সমর্থন আছে, ধর্মীয় যুক্তি আছে। বড়ুয়া-সমাজে ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর কোন পুস্তক বাহির হয় নাই। হিন্দু-সমাজে "হিন্দু জাতি মর রহি হায়" নামক একখানা হিন্দি-গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু উহাতে ধর্মীয় যুক্তি ও সমর্থন দুর্বল। গ্রন্থ প্রণেতা সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন মনে করিয়া ব্রণ-গালিত সমাজের মঙ্গলের জন্য সমাজের দেহে নির্ভীক-চিত্তে শস্ত্রাঘাত করিয়াছেন। ইতি পূর্বে এই সৎসাহস প্রদর্শন আর কেহ করেন নাই। গ্রন্থখানির চারি অংশ-(১) ভিক্ষু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ (২) দায়ক (৩) বিহার দায়ক (৪) গ্রাম্য-সমাজ। প্রতিটি অংশ বড়ুয়া-বৌদ্ধদের একান্তভাবে জানিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধের জীবদ্দশায় সদ্ধর্ম নবাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে এইরূপ কীর্তিত হইয়া থাকিত-"সেয্যথাপি পব্বতেয্যা গঙ্গা সমুদ্দ-নিন্না সমুদ্দ-পোণা সমুদ্দ-পহ্বারা সমুদ্দং এব আহচ্চ তিট্‌ঠতি এবমেব সমনস্‌স গোতমস্‌স চতুপরিসা নিব্বান-নিন্না নিব্বান-পোণা নিব্বান-পহ্বারা নিব্বানমেব আহচ্চ তিট্‌ঠতি।" ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, উপাসক ও উপাসিক এই চর্তুপরিষদ অন্তর-বাহির উভয় দিক হইতেই জন-সাধারণের স্পৃহনীয় ছিল। বুদ্ধ এবং ভিক্ষু-সংঘের সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বিধানেই সমাজের এই মনোহারিত্ব বিরাজমান ছিল। আজ কিন্তু সমাজে তীরবিদ্ধ বাপীর ন্যায়, কুসংস্কার-পাপ-শৈবালের দৌরাত্ম্যে পঙ্কাকীর্ণতায় অগভীর হইয়া ইতরেতর সমাজের ঘৃণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের মাহাত্ম্য বলিতে আর উহাতে কিছু দেখা যায় না। অথচ মনের শোচনীয় দৈন্যে এখনো তাহারা গৌরব মনে করে। এই গ্রন্থখানি হেন ব্যক্তিদের চৈতন্যোদয়ে সমর্থ হইবে।

প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন-"অন্যায় বাদ দিয়া ন্যায় পথে বিচরণ করাকেই বলে ধর্ম-পথে বিচরণ। ধর্মকে বাদ দিলে মানুষ পশুর পর্যায়ে গিয়া পড়ে।" সাধারণের পক্ষে ধর্মের বিচার ইহা অপেক্ষা কঠিন হওয়া উচিত নহে। তথাগত বুদ্ধ নীতি-ধর্ম প্রচারে এই যুক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন। গ্রন্থকার বৌদ্ধগণকে প্রব্রজিত ও গৃহীভেদে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বহুযুক্তি বলে প্রব্রজ্যা জীবনকেই শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয়। দাম্ভিক ও শ্রাস্ত্রানভিজ্ঞ গৃহীগণের প্রদুষ্ট মনের কূটতর্কই গ্রন্থকারের মনীষাকে উষ্মা প্রদান

করিয়াছে। এই উষ্মা সমাজের হিতাবহ। কেহ কেহ মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইলেই মানুষ জ্ঞানী হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষিত আর জ্ঞানী এক কথা নহে। সমাজে বহু ডিগ্রীধারী থাকিলেও তাহাদের কাহাকেও শ্রেষ্ঠ প্রব্রজিত-জীবন যাপনে কিম্বা সাধু-জীবন যাপনে বড় দেখা যায় না। জ্ঞানী ব্যক্তি কি অজ্ঞানের পথে বিচরণ করিতে পারে? গ্রন্থকার পণ্ডিতের পরিচয় দিতে গিয়া অনেকানেক শাস্ত্রীয় যুক্তি আহরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দায়ক ও বিহার-দায়ক সম্বন্ধে গ্রন্থকার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধার-জন্য দায়কগণ ভিক্ষুর প্রতি গর্হিত ব্যবহার করিয়া কিভাবে পাপ সঞ্চয় করিতেছে এই অধ্যায়দ্বয়ে তাহা শাস্ত্রীয় বাক্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকারের প্রতিটি উক্তি দায়কদের একান্ত প্রণিধান যোগ্য। বিহারের অধিকার নিয়া বিহার-দায়ক বা বংশধর কর্তৃক সমাজে ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হইয়া থাকে ইহা আমরা নিয়তঃ দেখিতে পাই। এই হীন প্রচেষ্টা যেমন তাহাদের পুণ্যক্ষয় করিতেছে তেমন তাহাদের অমানুষিকতাও বাড়াইয়া দিতেছে। গ্রন্থকার অতি বিচিত্রভাবে দায়কের শ্রেণীভাগ দেখাইয়া আমাকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছেন। ইহা আমি কোনদিন চিন্তাও করিতে পারি নাই। অনাথপিণ্ডদ ও মহাউপাসিকা বিশাখা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিহার-দায়ক-দায়িকাগণ সংঘে বিহার দান করিয়া স্বাধিকার প্রদর্শন করেন নাই, অনুরক্ষি মাত্র ছিলেন। শাস্ত্রে পুত্র-পৌত্রগণের সাংঘিক বিহারের সর্বাধিনায়কত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিহার দান করিয়া সমাজে এই নীচতা কোথা হইতে আসিল ঐতিহাসিকগণ নির্দেশ করিতে পারেন। রজককে বস্ত্র ধুইতে দিয়া কেহ দায়ক হয় না। যাহা দেওয়া হয় উহাতে যে ব্যক্তির কোন প্রকার স্বাধিকার থাকে না সে-ই উহার দায়ক। অনুরক্ষণের দ্বারা যে ব্যক্তি উহার ঔজ্জ্বল্য বিধান করে, সে দান-ফলকেই সমুজ্জ্বল রাখে। অধিকতার প্রদর্শন করিয়া দানফল খর্ব করে না।

চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার গ্রাম্য-সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ঃ-সম্-অজ্+ঘঞ্ প্রত্যয়ে সমাজ শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ একই সঙ্গে কাজ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া। সমাজের সকলের সমশক্তির অভাব। কিন্তু কেহ শক্তিহীন নহে। যাহার যেরূপ শক্তি, সেই শক্তি অনুসারেই সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপাত

করিবে। মধুমক্ষিকার মৌচাক নির্মাণে আমরা দেখিয়াছি, কেহ চক্র নির্মাণের কাজে, কেহ মধু আহরণের কাজে, কেহ জলাহরণের কাজে, কেহ রক্ষণের কাজে নিরত, কিন্তু কেহ আপন কর্তব্যের চুলমাত্র ব্যতিক্রম করে না। কাজ বিবিধ হইলেও উদ্দেশ্য তাহাদের এক। কাহারো কোন কাজ অপরের কাজে বাধা না জন্মাইয়া বিনা হুড়াহুড়িতে অতি শান্তভাবে মৌচাক নির্মিত হইয়া থাকে। মানব-সমাজের আদর্শও অনুরূপ হওয়া চাই। গ্রন্থকার বিবিধ-রূপে সমাজের কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় বড়ুয়া-বৌদ্ধগণ অবহিত না হইলে শোচনীয় পতন ঘটিবে সন্দেহ নাই।

"সম্মা জায়তে অরিয়ভাবং যস্মিং স সমাজো" সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য আর্যভাবের উৎপাদন। মৈত্রী, করুণা, মুদিতাদি বিশিষ্ট আর্যভাব সর্ববিধ কল্যাণের জননী। বড়ুয়া-সমাজ এদিকে সম্পূর্ণ অনবহিত অথচ উৎপথে বিচরণ করিয়া নিজেদেরকে সর্ববিধ হীনতায় নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থকার বুদ্ধবাক্য উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "কম্মং সত্তে বিভজতি যদিদং হীনপ্পনীততায়" কর্মই প্রাণীদিগকে শ্রেষ্ঠ ও হীন করিয়া বিভাগ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার কর্ম না করিয়া গায়ের জোরে বা জনবলে কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। অপচেষ্টা সমাজ-নেতৃদেরকে হীনতায় পর্যবসিত করিয়া দেয়।

গ্রন্থখানি জাগরণশীলদের জন্য অতি উপাদেয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি সমাজের বর্তমান আচার, শাস্ত্রীয় বৌদ্ধাচার পাশাপাশি রাখিয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র ; গোড়ামী প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার চিন্তাধারা সুমার্জিত, সুস্পষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সমাজের নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই তিনি যে ব্রণ-বিষিত সমাজদেহে অত্যন্ত সাবধানে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির

আমার সমাজ

ভিক্ষু ও বড়ুয়া-বৌদ্ধ

"দুল্লভো মনুস্সত্তানং"-মানবজন্ম লাভ অত্যন্ত দুর্ল্লভ। যদিও বা দেব-ব্রহ্মলোকে মনুষ্যলোক হইতে সুখ অত্যন্ত বেশী ; যদিও বা সমস্ত জীবই সুখাকাঙ্ক্ষী ; যদিও বা মনুষ্যলোক সুখ দুঃখ মিশ্রিত ; তথাপি মানব-জীবন সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরই কাম্য। কারণ মনুষ্যলোক কর্মক্ষেত্র এবং দেব-ব্রহ্মলোক পুণ্যবানদের ফলভোগের স্থান মাত্র। এই মনুষ্যলোক সুখ দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া এইখানে প্রজ্ঞালোভের সুবিধা বেশী। তাই বোধিসত্ত্বগণ পারমীসম্ভার পরিপূর্ণ করিবার জন্য দেব-ব্রহ্মলোক হইতেও স্বেচ্ছামৃত্যুকে বরণ করিয়া মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন এবং বুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ, অর্হৎ ও যোগী ঋষিগণ এইখানেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

মনুষ্য-জন্মের দুর্ল্লভতা

এই মনুষ্য-লোকে আমরা মানুষ, পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক-জাতি দেখিতে পাই। মানুষ বিচার শক্তি সম্পন্ন বলিয়া এবং অন্যায় বা অকুশল বর্জ্জন করিয়া ন্যায় বা কুশল বর্জন করিতে পারেন বলিয়া পশুপক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ। অন্যায় বাদ দিয়া ন্যায় পথে বিচরণ করাকেই বলে ধর্মপথে বিচরণ। ধর্ম বাদ দিলেই মানুষ পশুর পর্য্যায়ে গিয়া পড়ে। তাই পণ্ডিতেরা বলেন-

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্
ধর্ম্মোহি তেসামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেন হীনা পশুভির্সমানা।"

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারিটি স্বভাব-ধর্ম পশুতে ও মানুষে বিদ্যমান। ধর্মই মানুষকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। ধর্মহীন ব্যক্তি পশু সদৃশ।

পশু হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠতার কারণ

অতএব অধর্মের পথ বর্জন করিয়া ধর্মপথে জীবনকে পরিচালিত করিতে

অভিমত

পারিলেই দুর্ল্লভ মানবজীবন লাভের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

আগারিক ও অনাগারিক ভেদে মানুষের জীবন যাপনের দুইটি পথ গৃহীজীবন ভোগের পথ আর প্রব্রজ্যা জীবন ত্যাগের। ভোগের পথ দোষযুক্ত-আবিলতাপূর্ণ আর ত্যাগের পথ অনাবালি-পবিত্র। সর্বসাধারণ আবিলতাপূর্ণ ভোগের পথেই চলে। অতি অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবানই মাত্র পবিত্র ত্যাগের পথকে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হন। বুদ্ধ বলিয়াছেন-"সম্বাধো ঘরবাসো রজপথো, অব্‌ভোকাসো পব্বজ্জা।" ঘরবাস কৃত্যবহুল ও পাপময় বলিয়া সঙ্কীর্ণ ; প্রব্রজ্যা পুণ্যময় ও শান্তিপূর্ণ বলিয়া অসীম আকাশের মত উন্মুক্ত। অতএব গৃহী জীবন হইতে প্রব্রজ্যা-জীবন সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

জীবন যাপনের দুইটি পথ

কেহ কেহ মনে করিতে পারে ভিক্ষু হইয়া দুঃশীল জীবন যাপন করার চেয়ে গৃহী হইয়া পঞ্চশীল পালন করিয়া চলা শ্রেষ্ঠ নয় কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে-দুঃশীল ভিক্ষুও পর্য্যায় ভেদে শীলবান গৃহী হইতে শ্রেষ্ঠ। কোন পর্য্যায়ে? যে ব্যক্তি ভিক্ষু হইয়াও দুঃশীলতা করেন তিনি গৃহী থাকিলে তাহার চেয়েও কি শতগুণ বেশী দুঃশীলতা করিতেন না? আর যিনি গৃহী হইয়াও শীল পালন করেন তিনি ভিক্ষু হইলে তাহার চেয়ে বহুগুণ বেশী কি শীল পূর্ণ করিতেন না? বহু কারণের মধ্যে ইহা একটি, যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গৃহী-জীবন হইতে ভিক্ষু-জীবন শ্রেষ্ঠ।

দুঃশীল ভিক্ষুও শীলবান গৃহী হইতে শ্রেষ্ঠ
১ম প্রমাণ

ভিক্ষু-জীবনে মহাপাপ করিলেও গৃহী-জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ জীবন যাপিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে-মিলিন্দরাজ স্থবির নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন-"ভন্তে, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ নহেন অথবা মহাকরুণাবান নহেন। যদি সর্বজ্ঞ হইতেন, তিনি জানিতেন যে দেবদত্তকে উপসম্পদা দিলে সে সংঘভেদ করিয়া এক কল্পকাল অবীচি মহানরকে যন্ত্রণা ভোগ করিবে, জানিয়াই যদি তিনি তাহাকে নরকে পতিত করেন তাঁহাকে করুণাবান কিরূপে বলা যাইতে পারে? যদি করুণা করিয়াই তিনি তাহাকে উপসম্পদা দিয়া থাকেন তিনি জানিতেন না যে, "সে সংঘভেদ করিবে।" তদুত্তরে পূজনীয় নাগসেন স্থবির বললেন-"বুদ্ধ যেমন সর্বজ্ঞ তেমন

২য় প্রমাণ

মহাকরুণাবান। তিনি জানিয়াই করুণাবশতঃ দেবদত্তকে উপসম্পদা দিয়াছিলেন। বুদ্ধ জানিতেন যে দেবদত্ত ভিক্ষু হইয়া সংঘভেদ করতঃ কল্পকাল অবীচি নরকে দগ্ধ হইলেও তাহার অসীম দুঃখ সসীম হইবে।

ভিক্ষু না হইলেও সে এমন কাজ করিত যাহাতে সে অবীচি নরকে পতিত হইত অথচ তাহার দুঃখ অসীমই থাকিয়া যাইত।" দেবদত্ত ভিক্ষু হইয়া শুধু সংঘভেদরূপ আনন্তরিয় কর্ম করিল তেমন নয় ; সে বুদ্ধের পদ হইতে রক্তপাত জনিত অন্য আনন্তরিয় কর্মও করিয়াছিল এবং অজাত শত্রুর দ্বারা নিজের ধার্মিক স্রোতাপন্ন পিতাকেও হত্যা করাইয়াছিল। ভিক্ষু না হইলে হয়তঃ অজাতশত্রুকেও বশ করিতে পারিত না এবং ঐসব মহাপাপ ও করিতে পারিত না।

দেবদত্তের কৃতকর্ম

বর্তমানের কোন ভিক্ষু যদি একান্ত পাপই করে তাহা হইলে দেবদত্তের ন্যায় ত কেহ পাপ করিতে পারিবে না। দেবদত্তের প্রব্রজ্যা জীবন যদি গৃহী-জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে তবে অন্য দুঃশীল ভিক্ষুর কথাই বা কি?

অভিমত

সমাজে এমন হীন নিন্দুক কেহ কেহ আছে,যাহারা প্রব্রজ্যা-জীবনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং এই শ্রেষ্ঠ-জীবনকে বরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহারা বলে যে খাইতে না পাইয়া পেটের দায়ে ভিক্ষু হইয়াছে। অন্যকেহ বলে যে স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইতে না পারিয়া সংসার-ত্যাগী হইয়াছে ; আর কেহ বলে যে উপরে সাধুর বেশ ভিতরে সব শয়তানী ইত্যাদি। সাধুর ঐ সব দিকে ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নহে। হিন্দিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে-

সাধুর লোকনিন্দা উপেক্ষনীয়

"হাতী চলে রাস্তামে কুত্তা ভুকে হাজার
সাধুনকো দুর্ভাব নেহি যব নিন্দে সংসার।"

অর্থাৎ-রাস্তা দিয়ে হাতী চলে কুকুরেরা দলে দলে
পিছনেতে করে ঘেউ ঘেউ
হাতি নাহি ফিরে চায় সাধুরাও কি আসে যায়
ছি ছি যদি করে কেউ, কেউ।

অতএব সাধুর নিজেকে হাতীর ন্যায় ও হীন নিন্দুককে কুকুরের ন্যায় মনে করিয়া আপন মনে যথাশক্তি ধর্ম্মের পথে চলিতে হইবে।

সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করাও যে মঙ্গল তেমন প্রমাণও ত আছে। এক রাজা নাকি মনোমত বর না পাওয়াতে নিজের একমাত্র বড় মেয়েটি বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না। একরাত্রে রাণীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে রাজা বিরক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে ভোরে রোজোদ্যানে যেই সন্ন্যাসীকে প্রথমে দেখিবেন তাঁহাকেই অর্ধেক রাজ্যসহ মেয়েটি সম্প্রদান করিবেন। সেই রাত্রে এক দরিদ্র মেথর রাজবাড়ীতে চুরি করিতে আসিয়া তাহা শুনিতে পাইল এবং চুরি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে রোজোদ্যানের দরজার কাছে ধ্যানাসনে বসিয়া রহিল। রাজা খুব ভোরে উদ্যানে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া ভুলুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিলেন। সন্ন্যাসী ধ্যাননিমীলিত চক্ষু খুলিলেন না। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত রাজা এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে রাজা পুনঃ বন্দনা করিয়া বিনীতভাবে প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করিলেন। সন্ন্যাসী রাজার কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন-আমি সন্ন্যাসী নহি। শুধু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করাতে রাজা অর্ধেক রাজ্যসহ রাজকন্যা দিতে অনুরোধ করিতেছেন ; যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতাম তাহা হইলে কিরূপ হইত? এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই ছদ্মবেশী দরিদ্র মেথর রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া সেই সময় হইতে যথার্থ সন্ন্যাসী হইয়া গেল।

পাপ করার চেয়ে ধর্ম্মের ছলনাও ভাল

কোন কোন গৃহী মনে করে গৃহীদের পাঁচশীল আর ভিক্ষুদের দুইশত সাতাইশ শীল। গৃহীদের শীলভঙ্গ হইলে পাঁচশীলই ভাঙ্গে, আর ভিক্ষুদের শীলভঙ্গ হইলে বহুশীলই ভঙ্গ হয়। অতএব ভিক্ষুরা গৃহী হইতে বেশী দুঃশীল ও পাপী। যেইসব লোকের শীল সম্বন্ধে ও পাপ পুণ্য সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাহারাই মাত্র ঐরূপ মনে করিয়া থাকে। পাপ-পুণ্য চিত্তের অবস্থা। যখন অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তখনই পাপ, যখন কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তখনই হয় পুণ্য। বুদ্ধ বলিয়াছেন-"চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি"-"হে ভিক্ষুগণ চেতনাকেই আমি কর্ম বলি।" চেতনা চিত্ত প্রতিবদ্ধ চৈতসিক মাত্র। অতএব চিত্তের দিকদিয়া কুশল চিত্তই কুশল কর্ম এবং অকুশল চিত্তই অকুশল কর্ম। গৃহীর

ভিক্ষুরা গৃহী হইতে অধিকতর পাপী ধারণা

পক্ষে সাধারণতঃ যত অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হওয়া সম্ভব ভিক্ষুর পক্ষে তত সম্ভব নয়। তাহা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে। কায়বাক্যের অসংযমই দুঃশীলতা। আর গৃহীর পক্ষে সাধারণতঃ কায়-বাক্যের অসংযম যত সম্ভভ ভিক্ষুর পক্ষে তত নয়। অতএব গৃহী হইতে ভিক্ষু অধিকতর দুঃশীল বা পাপী হইতেই পারে না।

অভিমত

এই-সব যুক্তির দ্বারা আমি কোন প্রকারেই দুঃশীল ভিক্ষুকে সমর্থন করিতেছি না। দুঃশীলতার যে কত দোষ সেই বিষয়ে আমি অনবহিত নহি। এইখানে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি যে প্রব্রজ্যা-জীবন গৃহী-জীবন হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ মাত্র।

বেতাগী বনাশ্রমে বাস করিবার সময় এক উপোসথ দিবসে আমি পূজনীয় ধর্মানন্দ মহাস্থবিরের নিকট উপোসথ করিতে গিয়েছিলাম। তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বসিলেই তিনি বলিলেন-"লোথক হওয়া ভাল।" আমি তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। ভাবিলাম হঠাৎ ইহা কি কথা? তৎপর তিনি বলিতে লাগিলেন-"আমি ছেলে ও যুবকদিগকে বলিতেছি যে তোমরা ভিক্ষু শ্রামণ হও। যে যত দিন যত মাস বা যত বৎসর থাকিতে পার থাক। তারপর যে না পার সে লোথক হইয়া যাও। লোথক হইলেও সাধারণ গৃহী-জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ-জীবন যাপিত হইয়া থাকে।" আমি নিরবে তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম।

লোথকের পুত্রেরা অন্য গৃহীর পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ

তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন-"যতদিন প্রব্রজিত থাকা যায়-ততদিন যে পুণ্য হয় তৎ-প্রভাবে ইহ জীবনেও সুখ এবং উন্নতি হয়, পরলোকের কথাই বা কি? আমি দেখিতেছি যে যাহারা ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা যৌবন কালটি প্রব্রজ্যায় কাটাইয়াছে, বিষয়-সম্পত্তিতে তাহাদের সাংসারিক জীবন উন্নত না হইলেও তাহাদের ছেলে মেয়েরা, তাহাদের ভাইদেরও সেই স্তরের লোকদের ছেলে মেয়ে হইতে উন্নত।" তিনি অন্তত ২০/২৫টি উদাহরণ দিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া আমি বিচার করিয়া দেখি যে সত্যই ত। কয়েকটি উদাহরণ এইখানে আমি প্রদান করিতেছি ঃ-পাহাড়তলী নিবাসী কলমপ্রু লোথকের ছেলে প্রফেসার মহিম বাবু ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অপূর্ব বাবু প্রভৃতি যেমন উন্নত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তেমন উন্নত নয়। সুবল লোথক ও কিশোরী লোথকের ছেলেরা যেমন উন্নত সেইস্তরের লোকদের

ছেলেরা তেমন উন্নত নয়। বেতাগীতে সরুদাস লোথকের ছেলেরা যেমন উন্নত তাহার বড় ভাই গুরুদাসের ছেলেরা তেমন নয়। পশ্চিম আধার মানিক রাজ লোথকের ছেলে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হইতে বেশী উন্নত। বিনাজুরীতে কালীদাস লোথকের ছেলেরা সেই স্তরের লোকদের ছেলেগণ হইতে বেশী উন্নত। পটিয়া থানার অন্তর্গত সতর পিটুয়া গ্রামের কর্ণধর লোথকের ছেলেরা সেখানকার সকলের ছেলে হইতে উন্নত। বৈদ্যপাড়ার রায়বাহাদুর ধীরেন বাবু M. L. C ও রাঙ্গুনীয়ার দারোগা সতীশ বাবুও লোথকের ছেলে। লোথকের ছেলে সেই স্তরের লোকদিগের ছেলেদিগ হইতে ক্বচিৎ অনুন্নত হইলেও তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। লোথকের সাংসারিক জীবন দারিদ্র্য পূর্ণ হইলেও অন্য সাধারণ গৃহী জীবন হইতে ধর্মময় ও সুখময় হইয়া থাকে।

সুকর্মের ফল ইহজীবনেও লাভ হয়, পরজীবনের কতাই বা কি! মানুষ জ্ঞানের অভাবেই ভিক্ষুদিগকে ও লোথকদিগকে নিন্দা করে মাত্র। তবে ভিক্ষু-শ্রামণগণ লোথক হউক ইহা কখনও কাম্য নহে। উহা উচ্চস্তর হইতে পতনই।

অভিমত

তবে প্রথম গৃহী-জীবন যাপন হইতে শ্রেষ্ঠ প্রব্রজ্যা জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিয়া অক্ষমতায় পতন হইলেও যে সাধারণ গৃহী-জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত জীবন যাপিত হইয়া থাকে সেই সত্যই এইখানে প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। অতএব আমিও পূজনীয় মহাস্থবিরের ন্যায় বলি যে সক্ষম কিশোর ও যুবক প্রব্রজিত হউক এবং যে যতদিন পারে থাকুক, না পারিলে পরে চলিয়া যাউক, ইহাতেও নিজের এবং সমাজের ইহজীবনের ও পরজীবনের মহামঙ্গল হয়। এইরূপ করিলেও অনেকে থাকিয়া যাইবে এবং সমাজে চতুর্বিধ ভিক্ষুর অভাব হইবে না।

আমি মনে করি বড়ুয়া-সমাজের অবনতির যতগুলি কারণ আছে ঃ তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে উপযুক্ত, শিক্ষিত, জ্ঞানী ও শীলবান ভিক্ষুর অভাব। একজন

বড়ুয়া সমাজের অবনতির শ্রেষ্ঠ কারণ

শিক্ষিত, জ্ঞানী ও শীলবান ভিক্ষু নিজের এবং সমাজের ইহজীবন ও পরজীবনের যে হিত করিতে পারেন শতজন শিক্ষিত জ্ঞানী ও শীলবান গৃহী তাহার লক্ষাংশের একাংশও করিতে পারিবে না। কারণ তাহাদের তেমন অবকাশ নাই। বিশেষতঃ জ্ঞানী ভিক্ষুর কথা সকলেই যেইরূপ আগ্রহের সহিত শুনে ও পালন করে, জ্ঞানী গৃহীর কথা পালন করা দূরে থাকুক সেরূপভাবে শুনেও না।

বড়ুয়া-সমাজে বর্তমানে শিক্ষিতের বড় অভাব না হইলেও শিক্ষিতদের মধ্যে জ্ঞানীর সংখ্যা অতি কম। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী হইয়ার জন্য সাহায্য করে সত্য। তাই বলিয়া শিক্ষিত হইলেই মানুষ জ্ঞানী হয়, ইহা সত্য নহে। তাই যদি হইত বড়ুয়া-সমাজ শিক্ষিত ভিক্ষুর অভাবে এমন অধঃপতিত থাকিত না। শিক্ষিত ভিক্ষু না হইলে কে সমাজকে সমাজের উপকারী ধর্মনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিবেন? কে নূতন ভিক্ষু শ্রামণকে শিক্ষা দিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিবেন? কে নিজে আদর্শ ভিক্ষু-জীবন যাপন করিয়া সমাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেন?

শিক্ষিত হইলেই জ্ঞানী হয় না

শিক্ষিতদের জ্ঞানের অভাবে শিক্ষিতেরা ভিক্ষু হয় না বলার কারণ, ✓জ্ঞা জাননে। যথাযথ জানা বা দর্শন করাই জ্ঞানের কাজ। "যথাধম্ম অববোধন-লক্খনা হি পঞ্ঞা," জ্ঞান হীনকে হীন হিসাবে এবং শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ হিসাবেই দর্শন করিয়া থাকে। হীনকে ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করতঃ শ্রেষ্ঠ হওয়ার মূলেও জ্ঞানের প্রাধান্য। জ্ঞান হইলে মানুষের চিত্ত উদার হয়, মহৎ হয় এবং প্রশস্ত হয় ; নিজের এবং দশের-দেশের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রেরণা জাগে। ভিক্ষু হইলে নিজের এবং পরের ইহজীবনের এবং জন্ম-জন্মান্তরের যে হিত করিতে পারে গৃহী থাকিলে তাহা কখনও পারে না। তাই যথাযথ জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষু না হইয়াই পারেন না।

জ্ঞানশব্দের ব্যাখ্যা

বুদ্ধ কাহাকে পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলিয়াছেন?

"দিট্ঠেব ধম্মে যো অত্থো যো চ অত্থো সম্পরায়িকো
অত্থাভিসমযা ধীরো পণ্ডিতো'তি পবুচ্চতি।"

যিনি ইহজীবনের ও জন্ম-জন্মান্তরের মঙ্গল বুঝিতে পারেন তিনিই পণ্ডিত। অঙ্গুত্তর নিকায়ের বাল পণ্ডিতবর্গে বলিয়াছেন-"তীনি ইমানি ভিক্খবে পণ্ডিতস্স পণ্ডিত লক্খনানি পণ্ডিতা-পদানানি পণ্ডিত নিদানানি, কতমানি তীনি? পণ্ডিতো ভিক্খবে কায়েন ন দুচ্চরিতং চরতি, বাচায়ন দুচ্চরিতং চরতি, মনসা ন দুচ্চরিতং চরতি।" হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটিই পণ্ডিতের লক্ষণ, পণ্ডিতের অপদান ও পণ্ডিতের

বুদ্ধ কাহাকে জ্ঞানী বলিয়াছেন

নিদান। তাহা কি কি? ভিক্ষুগণ! পণ্ডিত কায়ের দ্বারা দুচ্চরিত আচরণ করেন না, অর্থাৎ প্রাণীহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার করেন না। বাক্যের দ্বারা দুচ্চরিত আচরণ করেন না অর্থাৎ মিথ্যা, পরুষ, পিশুন ও সম্প্রালাপ করেন না। মনের দ্বারা দুচ্চরিত আচরণ করেন না অর্থাৎ পরের সম্পত্তিতে লোভ, পরের অনিষ্ট চিন্তা ও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করেন না। সাধারণতঃ ভিক্ষুদের দ্বারা কায়, বাক্য ও মন দুচ্চরিত যতদূর বর্জন করা সম্ভব, গৃহীদের দ্বারা তত সম্ভব নয়। এই পর্যায়েও গৃহীগণ হইতে ভিক্ষুরা অধিকতর জ্ঞানী বা পণ্ডিত।

চতুর্বিধ ভিক্ষু ও সাধক ভিক্ষুর প্রভাব

আমি মনে করি সমাজের হিতের জন্য চারি প্রকার ভিক্ষুর প্রয়োজন। যথা-সাধক, শিক্ষক, দেশক বা প্রচার ও সমাজ-রক্ষক। সাধক ভিক্ষুরা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পূর্ণ করিবেন। তাঁহারা এই সব কাজের দ্বারা যদিও বা আত্মোন্নতি সাধনে রত ; যদিও বা তাঁহারা কাহারও হিতের জন্য ধর্মদেশনাদি না করেন তথাপি তাঁহারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ করিয়া থাকেন। কি প্রকারে?- আদর্শের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। ইহা ছাড়াও একজন শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা পূরণকারী ভিক্ষু যেইখানে বাস করেন তাঁহার প্রভাবে সেই স্থানের মহামঙ্গল হইয়া থাকে। মানুষেরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গুণের কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া সেবা করিয়া সম্মান-গৌরব প্রদর্শন করিয়া ও দান দিয়া বিপুল পুণ্য-সম্পদ লাভ করেন। শুধু সেইস্থানে নয়, তাঁহার শীলগুণ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়, যতদূর তাঁহার শীলগুণ বিস্তৃত হয় ততদূর দেব মানবের মহামঙ্গল হইয়া থাকে।

ত্রিবিধ প্রচার ও নীরব ভাষায় প্রচারের প্রভাব

ধর্মপ্রচার তিন প্রকার, মুখে বক্তৃতা দেওয়া, ধর্মপুস্তকাদি হাতে লিখা এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার দ্বারা জীবন দিয়া প্রচার করা। সাধক ভিক্ষু মুখে বা হাতে ধর্ম প্রচার না করিলেও জীবন দিয়া ধর্ম প্রচার করিয়া থাকেন, ত্রিবিধ প্রচারের মধ্যে জীবন দিয়া প্রচারই শ্রেষ্ঠ। মনীষী বেকন বলিয়াছেন-"An example is a world precept. An example is more contagious and infectious than precepts." একটি আদর্শ এক পৃথিবী উপদেশের সমান। আদর্শ উপদেশ হইতে বেশী সংক্রামক ও কার্য্যকরী। সাধক-ভিক্ষু নীরব থাকিলেও সমাজের মহাহিতকারী। তাঁহার নিরব-ভাষার প্রচার সমাজের

অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া সমাজকে মোহঘুম হইতে জাগ্রত করিয়া দেয়-বহু লোকের নিম্নমুখী জীবন-গতিকে উর্ধ্বমুখী করিয়া থাকে। তিনি বুদ্ধের নিম্নলিখিত উপদেশের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। যথা ঃ-"অত্তত্থং সম্পস্সমানেন হি ভিক্খবে অপ্পমাদেন সম্পাদেতব্বং ; পরত্থং সম্পস্সমানেন হি ভিক্খবে অপ্পমাদেন সম্পাদেতব্বং ; উভয়ত্থং সম্পস্সমানেন হি ভিক্খবে অপ্পমাদেন সম্পাদেতব্বং।" হে ভিক্ষুগণ যাহারা নিজের, পরের উভয়ের, ইহলোকের, পরলোকের ও উভয়লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহাদের অপ্রমত্তভাবে শ্রমণ ধর্ম পূরণ করা উচিত।

সাধক-ভিক্ষুর অভাবে সমাজ ধর্মীয় আদর্শ পায়না, তাই সমাজের উপরি উক্ত হিত হইতে পারে না।

শিক্ষক-ভিক্ষুরা শিক্ষাকামী ভিক্ষু শ্রামণ ও গৃহীদিগকে ধর্ম-বিনয় ও প্রয়োজনীয় নানা বিষয় শিক্ষা দিবেন। শিক্ষক ভিক্ষু হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া, ভিক্ষু শ্রামণ ও গৃহীরা ধর্ম-বিনয় ও বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন। সেই শিক্ষিত ভিক্ষু-শ্রামণদের মধ্যে কেহ শিক্ষক, কেহ সাধক, কেহ প্রচারক ও কেহ সমাজ রক্ষক ভিক্ষু হইয়া নিজের ও পরের মহা হিত সাধন করিবেন।

শিক্ষক ভিক্ষুর প্রয়োজনীয়তা ও অভাবে ক্ষতি।

শিক্ষক ভিক্ষুর অভাবে সমাজে সাধক, শিক্ষক, প্রচারক ও উপযুক্ত সমাজ রক্ষক ভিক্ষু দুর্ল্লভ হয়।

প্রচারক-ভিক্ষুরা স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়া সদ্ধর্ম প্রচার করিবেন। তাঁহারা ধর্মদানরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ দান দিয়া মানব সমাজের মহা হিত সাধন করিয়া থাকেন।

প্রচারক ভিক্ষুর প্রয়োজনীয়তা ও অভাবে ক্ষতি

প্রচারক ভিক্ষুর অভাবে সদ্ধর্ম বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বসাধারণের হিত সাধিত হইতে পারেনা।

সমাজ-রক্ষক ভিক্ষুরা সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়া সমাজকে ধর্মকার্য্যে সাহায্য করিবেন। সমাজ-রক্ষক ভিক্ষুর অভাবে সামাজিক ধর্মানুষ্ঠান অচল হয়। সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হইলে সমাজ তিষ্ঠে না, অশোকের সময়

সমাজ-রক্ষক ভিক্ষুর প্রয়োজনীয়তা ও অভাবে ক্ষতি

ভারতবাসী প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্মের করুণাশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভিক্ষুর অভাবে বিশেষতঃ সমাজরক্ষক ভিক্ষুর অভাবে কোটি কোটি বৌদ্ধ ধর্মান্তর গ্রহণ না করাতে আজ "হরিজনে" পরিণত হইয়া নির্য্যাতিত ও নিঃপীড়িত হইতেছে।

বড়ুয়া সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্দ্দশা এই যে-বড়ুয়া সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সমাজ-রক্ষক ভিক্ষুও মিলিতেছেনা। যাহারা সমাজের মহাহিতকারী তেমন সাধক, শিক্ষক ও প্রচারক ভিক্ষু কোথায় পাওয়া যাইবে? ব্রাহ্মণ হইতে যেমন ব্রাহ্মণ হয়, তেমন ভিক্ষু হইতে ত আর ভিক্ষু হয় না। গৃহী হইতেই ভিক্ষু হইতে হয়। শিক্ষিত যুবক ও প্রৌঢ়েরা ত ভিক্ষু জীবনের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। সমাজের এই দুর্দ্দশা কে মোচন করিবে? যৌবনকাল ভোগের সময় বলিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবক না হয় কামভোগে মজিতেছে। সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং পেন্সান প্রাপ্ত প্রৌঢ়েরা যদি "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" মহাজনের এই মহাবাণী অনুসরণ করিয়া ভিক্ষু-জীবনকে বরণ করিতেন, তাহা হইলেও আজ সমাজের এমন দুর্দ্দশা হইত না। সমাজে চতুর্বিধ ভিক্ষু বিরাজ করিত সমাজ সর্ব বিষয়ে সমুন্নত হইত।

বর্ত্তমানে সমাজ-রক্ষক ভিক্ষুরও অভাব

আমার মনে হয় ভিক্ষু না হওয়ার প্রথম কারণ ভিক্ষু জীবনের-কঠোরতা। দ্বিতীয় কারণ ভিক্ষু জীবনের মাহাত্ম্য বুঝিবার জ্ঞানের অভাব হেতু ভিক্ষুদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান গৌরবের অভাব বিশেষতঃ তদুপরি নিন্দা ও দুর্নাম প্রচার, তৃতীয় হইতেছে কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের অভাব।

ভিক্ষু না হওয়ার কারণ

ভিক্ষুদের নিন্দা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে যাহা আলাপ হইয়াছে তাহার কিছু এইখানে উল্লেখ করিতেছি। এক সময় একজন পূর্ব পরিচিত দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হইতেছিল, নানা আলাপের মধ্যে ছাত্রটি বলিল যে "ভিক্ষুরা সমাজের কোন কাজ করিতেছেন না।" তদুত্তরে আমি বলিলাম "ভিক্ষুদের শক্তি কোথায়? তোমরা শিক্ষিতেরা যদি প্রব্রজিত হও তাহা হইলে সমাজের মহোপকার করিতে পারিবে।" তদুত্তরে সে বলিল "উহা ত ভন্তে একটি ব্যবসায় মাত্র। এই ব্যবসায় দ্বারা সঞ্চিত

অর্থে শেষকালে বিবাহ করা হয়।" আমি বলিলাম-"মানিলাম ইহা ব্যবসায়। তুমি বি. এস-সি অথবা এম. এস-সি পাশ করিয়া চাকুরী করিবে অথবা কোন ব্যবসায় করিবে, ইহাতে সঞ্চিত অর্থে শেষে বিবাহ করিবে। ঐ চাকরী বা ব্যবসায় করিতে কত মিথ্যা, শঠতা, বঞ্চনা ও চুরি করিতে হয়, আর পবিত্র ভিক্ষু ব্যবসায় করিতে ইহাদের কিছুই করিতে হয় না। কোন ব্যবসায় শ্রেষ্ঠ? নিষ্পাপ পবিত্র ভিক্ষু-ব্যবসায় না তোমাদের শঠতা বঞ্চনাদিপূর্ণ হীন গোলামগিরি ও নীচ ব্যবসায়? তোমার ত তেমন সৌভাগ্য নাই যে নিষ্পাপ পবিত্র ভিক্ষু ব্যবসায় করিয়া সেই অর্থে বিবাহ করিতে, শক্তি থাকে আসত দেখি, তোমাকে বিবাহ করিতে আমরা বাধা দিব না।"

ভিক্ষু জীবন একটি ব্যবসায় মাত্র

দুইজন গ্রেজুয়েট সমাজ সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন-"Bhikshus are the parasites of the society"- ভিক্ষুরা সমাজের পরগাছা। অর্থাৎ ভিক্ষুরা সমাজের কোন কাজ না করিয়া সমাজের রক্ত চুষিয়া খাইতেছেন মাত্র। এই সব শিক্ষিতেরা তলাইয়া দেখেন নাই যে ভিক্ষুরা আপন আপন শক্তি অনুযায়ী সমাজের যেই উপকার করেন তাঁহাদের উপকারের প্রত্যুপকার করা সমাজের পক্ষে অসম্ভব, তাহা পরে বলিতেছি, এমন মহোপকার করিলেও অজ্ঞ বা বিজ্ঞ, শীলবান বা দুঃশীল কোন ভিক্ষু কখনও দাবী করেন না যে আমাকে ইহা বা উহা দিতেই হইবে। যেই বস্তুর জন্য যে ভিক্ষু নিমন্ত্রিত, নিমন্ত্রণ কারীরা নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া সেই ভিক্ষুই মাত্র নিমন্ত্রণকারীদের নিকট ঐ বস্তুই চাহিয়া থাকেন।

ভিক্ষ সমাজের পরগাছা

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছে "ভিক্ষুরা টাকা পয়সা নেয় কেন? 'ওয়া খরচ নেয় কেন? বাড়ীতে টাকা পয়সা দেয় কেন?' উত্তরে বলিয়াছি-"টাকা লওয়ার কারণ চট্টগ্রামে দায়ক নাই বলিয়া, "ওয়া খরচ" নেয় নিমন্ত্রণ করিয়া পান, তামাক, চা, চিনি, তৈল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু দেয় না বলিয়া। বাড়ীতে টাকা পয়সা দেয় তাহাও দায়কের অভাবে, বিশেষতঃ বড়ুয়ারা অকৃতজ্ঞ বলিয়া। যে ভিক্ষু সারাজীবন গৃহীদের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া শীল প্রদান করিয়া ও শক্তি অনুযায়ী ধর্মদেশনা করিয়া সমাজের হিত সাধন করিয়াছেন,

ওয়া খরচ গ্রহণ ও বাড়ীতে সাহায্যের কারণ

সেই ভিক্ষুর রোগ হইলে তাঁহাকে ঔষধ-পথ্য দিবার বা সেবা করিবার কেহও থাকেনা। বার্ধক্য হেতু সামাজিক কাজ করিতে অক্ষম হইলে কেহই তাঁহার খবর রাখেনা। তাঁহাকে রোগের সময় ও বৃদ্ধকালে বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হয়। বাড়ীতে সাহায্য না করিলে আত্মীয় স্বজন কোথা হইতে সাহায্য করিবে?"

ভিক্ষুরা সমাজের কি উপকার করে সমাজ তাহা বুঝে না। ভিক্ষুর উপকারের প্রত্যুপকার যে অসম্ভব। বুদ্ধ মজ্ঝিম নিকায়ের দক্ষিণা বিভঙ্গ সুত্রে বলিয়াছেন **"যং হি আনন্দ পুগ্গলো পুগ্গলং আগম্ম বুদ্ধং সরণং গতো হোতি, ধম্মং সরণং গতো হোতি, সঙ্ঘং সরণং গতো হোতি ; ইমস্স আনন্দ পুগ্গলস্স ইমিনা পুগ্গলেন ন সুপ্পতিকারং বদামি অভিবাদন পচ্চুট্ঠান-অঞ্জলী কম্ম সামীচিকম্ম-চীবর পিণ্ডপাত সেনাসন গিলান-পচ্চয়-ভেসজ্জ পরিক্খারানুপ্পদানেন"**-আনন্দ! যেই পুদ্গলকে অর্থাৎ গুরুকে অবলম্বন করিয়া যেই পুদ্গল অর্থাৎ শিষ্য বুদ্ধের শরণে গমন করে, ধর্ম্মের শরণে গমন করে, সঙ্ঘের শরণে গমন করে ; আমি বলি অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি কর্ম্ম সামীচিকর্ম-চীবর পিণ্ডপাত-শয়নাসন ও রোগীর ঔষধ পথ্য প্রদানের দ্বারা সেই শিষ্য কর্ত্তৃক সেই গুরুর উপকারের প্রত্যুপকার হইতে পারে না।

ভিক্ষুর উপকারের প্রত্যুপকার অসম্ভব ১ম প্রমাণ

তৎপর সেই সুত্রেই উক্ত হইয়াছে-"যং হি আনন্দ পুগ্গলো পুগ্গলং আগম্ম পানাতিপাতা পটিবিরতো হোতি, আদিণ্ণাদানা.....কামেসু মিচ্ছাচারা.....মুসাবাদা.....সুরামেরেয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা পটিবিরতো হোতি ; ইমস্স আনন্দ পুগ্গলস্স ইমিনা পুগ্গলেন.....ভেসজ্জ পরিক্খারানুপ্পদানেন।"-আনন্দ! সেই পুদ্গলকে অবলম্বন করিয়া যেই পুদ্গল প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হয়,.....চুরি...., ব্যভিচার মিথ্যা, নেশাপান হইতে বিরত হয় আমি বলি অভিবাদন, প্রত্যুত্থান অঞ্জলিকর্ম সামীচিকর্ম-চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন ও রোগীর ঔষধ পথ্য প্রদানের দ্বারা সেই শিষ্য কর্ত্তৃক গুরুর উপকারের প্রত্যুপকার হইতে পারে না।

ভিক্ষুর উপকারের প্রত্যুপকার অসম্ভব ২য় প্রমাণ

তৎপর বলা হইয়াছে-"যং হি আনন্দ পুগ্গলো পুগ্গলং আগম্ম বুদ্ধে অবেচ্চপ্পসাদেন সমন্নাগতো হোতি, ধম্মে....., সঙ্ঘে

৩য় প্রমাণ

অবেচ্চপ্পসাদেন সমন্নাগতো হোতি ; অরিয়কন্তেহি সীলেহি সমন্নাগতো হোতি ইমস্স আনন্দ পুগ্গলস্স.....গিলান পচ্চয় ভেসজ্জ পরিক্খারানুপ্পাদানেন।"- আনন্দ যেই পুদ্গল যেই পুদ্গলকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধের প্রতি অচল শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়, ধর্মের প্রতি.....সঙ্ঘের প্রতি অচল শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয় ; আর্য্যদের প্রিয় শীল সমূহে সমন্নাগত হয় ; আমি বলি.....-প্রত্যুপকার হইতে পারে না।

তৎপর উক্ত হইয়াছে-"যং হি আনন্দ পুগ্গলো পুগ্গলং আগম্ম দুক্খে নিক্কঙ্খো হোতি, দুক্খ সমুদয়ে.....দুক্খ নিরোধে.....দুক্খ নিরোধগামিনী পটিপদায়....ইমস্স আনন্দ পুগ্গলস্স ইমিনা পুগ্গলেন.....গিলানপচ্চয় ভেসজ্জ পরিক্খারানুপ্পদানেন।"-আনন্দ! যেই পুদ্গল যেই পুদ্গলকে অবলম্বন করিয়া দুঃখে নিঃসন্দেহ হয়, সমুদয়ে....., নিরোধে.....এবং মার্গে নিঃসন্দেহ হয় ; আনন্দ! আমি বলি.....প্রত্যুপকার হইতে পারেনা।

৪র্থ প্রমাণ

ভিক্ষুরা নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী গৃহীদের উপরি উক্ত উপকার করিয়া থাকেন। অতএব কোন প্রকারেই গৃহীদের পক্ষে ভিক্ষুদের উপকারের প্রত্যুপকার করা সম্ভব নয়।

অভিমত

বুদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়ের দুক নিপাতে "ন সুপ্পতিকার সুত্ত" এ বলিয়াছেন- **"দ্বিন্না'হং ভিক্খবে ন সুপ্পতিকারং বদামি মাতুচ্চপিতুচ্চ। একেন ভিক্খবে অংসেন মাতরং পরিহরেয্য, একেন অংসেন পিতরং পরিহরেযত! বস্সসত্তাযুকো বস্সসতজীবি সো চ নেসং উচ্ছাদন-পরিমদ্দন নহাপন-সম্বাহনেন-তে চ তত্থেব মুত্ত-করীসং চজেয্যুং নত্বেব ভিক্খবে মাতাপি তুন্নং কতং বা হোতি পতিকতং বা।"**-হে ভিক্ষুগণ! মাতা ও পিতা এই দুইজন ব্যক্তির উপকারের প্রত্যুপকার হয় বলিয়া আমি বলিতেছিনা। যদি কোন জ্ঞানী সন্তান শতবৎসরজীবি মাকে দক্ষিণ স্কন্ধে এবং পিতাকে বাম স্কন্ধে লইয়া বিচরণ করে এবং তথায় তাঁহাদের যাবতীয় সেবা শুশ্রূষা করে, সেইখান হইতে তাঁহাদিগকে নামিতে দেয় না ; তথায়ই তাঁহারা মলমূত্র ত্যাগ করেন তথাপি মাতাপিতার যথাযথ উপকারের প্রত্যুপকার করা হয় না। তৎপর তিনি বলিতেছেন-**"ইমিস্সা চ ভিক্খবে মহাপঠবিয়া পহুতসত্তরতনায় মাতাপিতরো ইস্সরিযাধিপচ্চে রজ্জে পতিট্ঠপেয্য নত্বেব ভিক্খবে মাতা**

পিতুন্নং কতং বা হোতি পতিকতং বা।" যদি কোন পুণ্যবান সন্তান মাতাপিতাকে সপ্তরত্ন পরিপূর্ণ এই মহাপৃথিবীর অধিপত্য বা চক্রবর্তী রাজত্ব প্রদান করে তথাপি মাতা পিতার যথাযথ উপকার এবং প্রত্যুপকার করা হয় না। মাতা-পিতার যথাযথ উপকারের প্রত্যুপকার করা কি একেবারে অসম্ভব? অসম্ভব নয় সম্ভব। তাহা দেখাইবার জন্য বুদ্ধ তৎপর বলিতেছেন-**যো চ ভিক্খবে মাতা-পিতরো অস্সদ্ধে সদ্ধাসম্পদায়, সমাদপেতি নিবেসেতি পট্ঠাপেতি ; দুস্সীলে সীলসম্পদায়.....মচ্ছরি চাগ সম্পদায়..... ; দুপ্পঞ্ঞে পঞ্ঞাসম্পদায় সমাদপেতি নিবেসেতি পতিট্ঠাপেতি এত্তাবতা খো ভিক্খবে মাতাপিতুন্নং কতঞ্চ হোতি পতিকতঞ্চ অতিকতঞ্চ।"**-হে ভিক্ষুগণ! যেই জ্ঞানী সন্তান অশ্রদ্ধাবান মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা সম্পত্তি লাভে উৎসাহিত করে, উহাতে নিবিষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত করে; দুঃশীল মাতাপিতাকে শীল সম্পত্তি লাভে.....কৃপণ মাতাপিতাকে ত্যাগ সম্পত্তি লাভে.....। অজ্ঞানী মাতাপিতাকে জ্ঞান সম্পত্তি লাভে উৎসাহিত করে, উহাতে নিবিষ্ট করে এবং প্রতিষ্ঠিত করে ; সেই সন্তানই মাতাপিতার যথার্থ উপকার করে ; শুধু উপকার করে নহে, উপকারের প্রত্যুপকার করে ; শুধু প্রত্যুপকার করে নহে, তাহা হইতেও অনেক বেশী করে। অর্থাৎ সেই সন্তানের উপকারের প্রত্যুপকার মাতাপিতা করিতে পারেন না।

৫ম প্রমাণ

ভিক্ষুরা নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী অশ্রদ্ধাবান গৃহীকে শ্রদ্ধা সম্পত্তি লাভে উৎসাহিত করেন তাঁহাদের উপনিশ্রয়ানুযায়ী উহাতে নিবিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত করেন। সেইরূপ দুঃশীলকে শীল সম্পত্তি লাভে, কৃপণকে ত্যাগ সম্পত্তি লাভে ও অজ্ঞানীকে জ্ঞান সম্পত্তি লাভে উৎসাহিত করেন, উহাতে নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। অতএব ভিক্ষুদের উপকারের প্রত্যুপকার গৃহীদিগ কর্তৃক কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

অভিমত

দীর্ঘ নিকায়ের "সক্ক পঞ্হ্ সুত্ত" এ বুদ্ধ বলিয়াছেন

"ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি।
ধম্মরসো সব্বরসং জিনাতি।
ধম্মরতি সব্বরতিং জিনাতি
তন্হক্খয়ো সব্বদুক্খং জিনাতি।"

৬ষ্ঠ প্রমাণ

ধর্মদান সর্বদানকে, ধর্মরস সমস্ত রসকে, ধর্মানন্দ সমস্ত আনন্দকে এবং তৃষ্ণাক্ষয় সমস্ত দুঃখকে জয় করে। অর্থকথায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে-কেহ যদি সমস্ত পৃথিবীকে ঢোলের পিঠের ন্যায় সমতল করাইয়া তাহাতে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র একজন সম্যক সম্বুদ্ধ, এক লাইন প্রত্যেক বুদ্ধ, দেড় লাইন অর্হৎ, আড়াই লাইন অনাগামী, পাঁচ লাইন সকৃদাগামী ও দশ লাইন স্রোতাপন্ন বসাইয়া সুমেরু পর্বতের সমান চর্তুপ্রত্যয় দান করে ; আর সেই বিপুল দানের অনুমোদনের জন্য যদি দুই লাইন সমন্বিত একটি গাথা বলা হয় ; সেই বিপুল দানের ফল এই দুই লাইনের গাথাযুক্ত ধর্মদানের ফলের ষোল ভাগের এক ভাগও হইবে না। কারণ ধর্ম শুনিয়াই সকল প্রকার অকুশল বর্জন করিয়া দান, শীল ভাবনাদি যাবতীয় কুশল সম্পদান করা হয়।

"বলদান সুত্ত" এ বলা হইয়াছে-"অমতন্দদ সো হোতি যো ধম্মমনুসাসতি"-যিনি ধর্মানুশাসন করেন তিনি অমৃত দিয়া থাকেন।

অভিমত

এমন ভিক্ষু নাই যিনি নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কিছু না কিছু ধর্মকথা বলেন না। অতএব ভিক্ষুর উপকারের প্রত্যুপকার কোন গৃহীই করিতে পারে না।

মঙ্গল সূত্রের "মাতা পিতৃপট্ঠানং" মঙ্গল দেশনায় অর্থকথায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে-মাতাপিতা দুঃশীল হইলেও তাঁহাদের সেবা পূজায় মহাপুণ্য হইয়া থাকে। কারণ তাঁহারা সন্তানের মহোপকারী বলিয়া। সেই দুঃশীল

ভিক্ষুর বিরুদ্ধাচরণে মহাপাপ

মাতা বা পিতাকেও হত্যা করিলে অর্হৎ হত্যার ন্যায় আনন্তরিক কর্ম হয়, অর্থাৎ তাহাকে একান্তই অবীচি নরকে পতিত হইতে হয়। ধর্মগুরু ভিক্ষুরা প্রায় ক্ষেত্রে মাতাপিতা হইতেও বেশী উপকারী। এমন উপকারী ও শ্রেষ্ঠ প্রতিপদায় প্রতিপন্ন ভিক্ষুকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিয়া দেয় না, তাঁহাদের নিন্দা করে এবং বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের যে মহাপাপ হইবে তাহাতে কথাইবা কি?

বুদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়ের সপ্ত নিপাতে "অগ্গি সুত্ত" এ সাত প্রকার অগ্নি দেশনা করিয়াছেন ; যথা-লোভাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি, গৃহত্যাগ্নি আহুনেয়্যাগ্নি, দাক্ষিনেয়্যাগ্নি ও কাষ্ঠাগ্নি। কাষ্ঠাগ্নির প্রভাব সকলের প্রত্যক্ষীভূত! উহার সদ্ব্যবহারে মানুষেরা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া খায়। অন্ধকারে আলো

জ্বালিয়া আপনাদের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করে। উহার সদ্ব্যবহারের দ্বারা মানুষ ঘুটঘুটে অন্ধকারে ও শহরকে বিবিধ আলোকমালায় সুসজ্জিত করিয়া দিবালোকের ন্যায় আলোকিত করিয়া থাকে, উহারই সাহায্যে জলে ষ্টীমার স্থলে ট্রেন এবং আকাশে প্লেন চলিতেছে। আগুনের সদ্ব্যবহারের জগতের যে কি বিপুল হিত হইতেছে তাহার পরিমাণ করা যায় না। ইহার দুর্ব্যবহারেও ঠিক সেই পরিমাণ জগতের ক্ষতি হইয়া থাকে, কারণ "Action and re-action are equal." ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমান। জোনাকীর আলোক খণ্ডের মত ক্ষুদ্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গেরও যদি অপব্যবহার করা যায়, উহা শুধু গৃহ ও গৃহের আসবাব পত্র নয়, সমুন্নত গ্রামের পর গ্রাম এবং সমৃদ্ধশালী নগরের পর নগরকেও ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া থাকে। অগ্নির অপব্যবহারের দ্বারাই কামান বন্দুক চলে এবং বোমা বিস্ফুরিত হইয়া সুন্দর ও প্রিয় বস্তুর সহিত কোটি কোটি মানবের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে।

অগ্নি সূত্রের আংশিক ব্যাখ্যা

দাক্ষিনেয়্যাগ্নি বলা হয় ভিক্ষু শ্রামণকে। এই সুত্রে বুদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণকে অগ্নির ন্যায় মনে করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। অগ্নি সেবায় যেমন মানব সমাজের মহা মঙ্গল হয় এবং অবজ্ঞায় তেমন অমঙ্গল হয় ; সেইরূপ ভিক্ষু শ্রামণদের সেবায় মহা মঙ্গল হয় এবং অবজ্ঞায় মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে।

গৃহপত্যাগ্নি-ঘরের কর্তা। মাতৃজাতির পক্ষে স্বামী। আহুনেয়্যাগ্নি-মাতাপিতা। ইহাদের সেবায় মহাপুণ্য এবং বিরুদ্ধাচরণে মহাপাপ হইয়া থাকে।

বুদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতে "ন উঞ্ঞাতব্ব সুত্ত" এ বলিয়াছেন- **হে ভিক্ষুগণ! এই চারিজন ক্ষুদ্র হইলেও অবজ্ঞা করা উচিত নয় অবজ্ঞা করিলে মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে। সেই চারিজন কে কে? অগ্নি, বিষধর সর্প, রাজকুমার ও প্রব্রজিত। অগ্নির কথা উপরে উক্ত হইয়াছে।** বিষধর সর্প ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করিলে তাহার দংশনে মৃত্যু ঘটে। রাজকুমার রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত হইলে সপরিবারে বিনাশ করিতে পারে। প্রব্রজিত তদ্রূপ কিছু না করিলেও তাঁহার শীল প্রভাবে অবজ্ঞাকারীর মহা অনিষ্ট হইয়া থাকে।

"ন উঞ্ঞাতব্ব সুত্ত" এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রব্রজিতের বিরুদ্ধাচরণকারীর ইহ জীবনে নানা প্রকারের দুঃখ-বিপদ ও জন্মান্তরে নরকাদি বিবিধ দুঃখ ভোগের কথা জাতকাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, বর্তমানে জীবিত, বয়স্ক ও অভিজাত ব্যক্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাইবেন যে সমাজে যিনি দুঃশীল ভিক্ষু বলিয়া কথিত, তাঁহারও যে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধাচরণকারীর কিছুতেই সুখ সমৃদ্ধি হয় নাই।

ভিক্ষু নিন্দুকের দুঃখ দুর্দ্দশা

বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও গৃহীদের মধ্যে যাজক, যজমান সম্বন্ধ নহে, হইতেও পারেনা। ঐ মিথ্যা ধারণা পার্শ্ববর্তী হিন্দু ও মুসলমান সমাজ হইতে বড়ুয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ মিথ্যা ধারণা বড়ুয়া সমাজে প্রবেশ করিয়া বড়ুয়াদের মহাক্ষতি করিয়া আসিতেছে। হিন্দুদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদের পুরোহিত মৌলবী গৃহী। তাঁহারা অন্যান্য সকল গৃহীর ন্যায় স্ত্রীপুত্র, ধনসম্পত্তি ও গৃহস্থালী নিয়া গৃহী জীবন যাপন করিয়া থাকেন। কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলে তাঁহারা আপন আপন গৃহস্থালী ত্যাগ করিয়া সহজে অন্য স্থানে যাইতে পারেন না। ভিক্ষুরা কিন্তু সন্ন্যাসী ; সেই জন্য কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলেই ভিক্ষু সেই বিহার ত্যাগ করিয়া অন্য বিহারে চলিয়া যান। হিন্দুদের ধর্ম্মানুযায়ী দেবপূজাদি ব্রাহ্মণদের কাজ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত (এমন কি সেই ব্রাহ্মণ দুঃশীল এবং অজ্ঞ হইলেও) অন্য কোন হিন্দু (তিনি খুব পণ্ডিত এবং চরিত্রবান হইলেও) করিবার বিধি নাই, সেইরূপ মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী মৌলবীদের কাজ তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে ; অন্য কেহই করিতে পারিবে না। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের বিধি তেমন নয়-এখানে প্রত্যেক বৌদ্ধই আপন আপন ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করিতে পারেন, যিনি ভিক্ষুর সাহায্য প্রার্থনা করেন তাঁহাকে ভিক্ষু সাহায্য করেন মাত্র।

ভিক্ষুরা পুরোহিত নহেন। পুরোহিত শব্দের আভিধানিক অর্থ যাজক ; যজ্ঞ ও দেবপূজাদি সম্পদানকারী। পুরের হিত করে এই অর্থে যদি পুরোহিত বলা হয় ; পুরের হিত কে না করে? প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্তরে আপন শক্তি অনুযায়ী পুরের হিত করিয়া থাকে। পুর অর্থ বাড়ী, নগর প্রভৃতি ; যথা অন্তঃপুর। পুরোহিত শব্দের

পুরোহিত শব্দের অর্থ

প্রকৃত ভাবার্থ মানুষ এবং দেবতা বা ঈশ্বরের মধ্যস্থ সত্ত্ব। এই পুরোহিতের মাধ্যমেই স্বর্গ বা ঈশ্বরের নিকট যাইতে হয়। অতএব এই পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে দেবলোক বা ঈশ্বরের নিকট যাওয়া কখনও সম্ভব নয়।

পুরোহিতের অত্যাচার

এমন সময়ও ছিল এই পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া কোন কোন যজমানকে নিঃস্ব হইতে হইয়াছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে এমন বিশ্বাস ছিল যে পোপের সার্টিফিকেট ব্যতীত কেহও স্বর্গে যাইতে পারিবে না। কাহারও মাতাপিতা প্রভৃতি মরণমঞ্চে শায়িত হইলে পোপকে সন্তুষ্ট করিয়া মরণাপন্ন ব্যক্তির জন্য সার্টিফিকেট আদায় করিতে কাহাকে কাহাকে নিঃস্ব হইতেও হইয়াছিল। এই ভারতেও পুরোহিতের অত্যাচার বড় কম ছিল না। সেই জন্য কোন কোন কুটতার্কিক ব্যক্তি পুরোহিত-সম্প্রদায়কে অপদস্থ করিবার জন্য পুরোহিত শব্দের এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা-পুরীষস্য "পু", রোষস্য 'রো', হিংসায় "হি" তস্করস্য "ত", এই চারি শব্দের চারি আদি অক্ষর নিয়াই পুরোহিত শব্দের উৎপত্তি, অর্থাৎ পুরোহিতের অন্তঃকরণ পায়খানার মত অপবিত্র ; হিংসায় এবং ক্রোধে ভরা, পুরোহিত তস্কর বা চোরও বটে।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি ভিক্ষুরা পুরোহিত নহেন। কেহ হয়তঃ বলিতে পারে "তবে আমরা ভিক্ষুকে পুরোহিত (চাউল কলাদি) দিই কেন?" উহা এবং আরও অন্যান্য দ্রব্যাদি দান দিয়া ধর্ম কার্যে সাহায্যকারীকে পূজা করা হয় মাত্র। উহাকে ধর্ম-পূজা বলা হয়। বার্ম্মারা ইহাকে "থারা পই" বলে "থারা পই" অর্থ ধর্মপূজা। সমাজে এই প্রথা কুপ্রথা নহে, সুপ্রথা। বড়ুয়ারা অর্থে ও ধর্মে বিশেষতঃ ধর্মে অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া বড়ুয়াদের ধর্মপূজাও অত্যন্ত দরিদ্র। সমাজের প্রথানুযায়ী এইভাবে ধর্মপূজা (যদিও বা তাহাও সকল স্থানে নাই)। ব্যতীত বড়ুয়াদের মধ্যে ধর্মপূজা নাই বলিলেও হয়। বড়ুয়া সমাজে শাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষিত ভিক্ষুর অভাব হওয়ার ইহাও একটি কারণ। **ধর্মপূজা কি? শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুকে ধর্মপূজার সংজ্ঞায় বিবিধ বস্তু দান দিয়া পূজা করাকেই ধর্মপূজা বলা হয়**। বুদ্ধ-শাসনে আনন্দ

ধর্মপূজা

স্থবির ছিলেন ধর্ম-ভাণ্ডাগারিক। সেইজন্য তাঁহার জীবিতাবস্থায় তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী ধর্মপূজা পাইয়াছিলেন। কথিত আছে অন্যান্য দ্রব্য ব্যতীত তিনি যত চীবর পাইয়াছেন, সাধারণ চীবর বাদ দিলে, যে চীবরের দান নাকি লক্ষ টাকা তেমন চীবর শতবার, সহস্র টাকা মূল্যের চীবর সহস্রবার এবং শত টাকা মূল্যের চীবর লক্ষবার দান পাইয়াছিলেন। বার্মা প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশে ধর্মদেশক ভিক্ষুরা ধর্মপূজা হিসাবে বিপুল দান পাইয়া থাকেন। এমন কি কোন কোন দায়ক যদি নিজের ছোট শ্রামণকেও বিশেষ কিছু দান দিতে ইচ্ছা করেন শ্রামণের গুরু দ্বারা ঐ শ্রামণকে ধর্মদেশনা শিক্ষা করাইয়া সংঘ নিমন্ত্রণ করাইয়া দান দেন এবং দানের পর ধর্ম সভায় ঐ শ্রামণ হইতে ধর্ম শুনিয়া ধর্ম পূজার সংজ্ঞায় তাঁহাকে বিপুলভাবে দান দেয়। ইহাতে দায়কের দ্বারা সংঘ পূজা, ধর্মপূজা এবং তৃতীয়তঃ নিজের শ্রামণকে নানা কিছু দান দিয়া দায়কের কর্তব্যও সম্পাদন করা হয়। এই ধর্মপূজা করিয়া দায়কেরা বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করেন। কারণ এক পর্য্যায়ে ধর্ম বুদ্ধ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম লাভ করিয়াই ত তিনি বুদ্ধ হইয়াছেন। যেই কারণে বুদ্ধ ধর্মকে সৎকার সম্মান ও গৌরব করিয়া চলিতেন।

ইহাতে শুধু পুণ্যলাভ হয় তেমন নয় ইহার দ্বারা ভিক্ষু ও গৃহী উভয় সমাজেরই অপ্রমেয় মঙ্গল হইয়া থাকে। ভিক্ষুদের মঙ্গল হয় ধর্মধর ভিক্ষুদের মানসম্মান ও লাভ সৎকার দেখিয়া অন্যান্য ভিক্ষুগণও ধর্মধর হইতে চেষ্টা করেন এবং ধর্মধর হন। ইহা তাঁহাদের লৌকিক ও লোকোত্তর সুখ লাভের কারণ হইয়া থাকে। ইহাতে সমাজে শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুর অভাব হয়না বলিয়া গৃহীরা এইসব পণ্ডিত ভিক্ষু হইতে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া ইহজীবনে ও জন্ম-জন্মান্তরে সুখী হন এবং অবশেষে শান্তিময় নির্বাণ লাভ করেন।

ধর্মপূজায় ভিক্ষু ও গৃহীর মঙ্গল

বড়ুয়া-সমাজে কিন্তু সোনা ও তামার একদর। যেই ভিক্ষু কঠোর কষ্ট করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছেন তিনি যে কোন দান যজ্ঞে গিয়া ধর্ম দেশনার দ্বারা দায়কের পুণ্য বিপুলভাবে বর্ধন করেন। যে কোন সভায় গিয়া সভাকে জ্ঞান ও আনন্দ দিয়া মুগ্ধ করেন। অন্য পক্ষে শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ শতজন ভিক্ষু ও দান

যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিত ভিক্ষুর কোটি অংশের একাংশ ও দায়কের পুণ্য বর্ধন করিতে পারেন না। অন্য সভার কথাই বা কি? শুধু গভীর রাত্রি পর্যন্ত অথবা সারারাত্রি জাগিয়া ধর্মদেশনা করিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে সাধারণ ভিক্ষুরা সারাজীবন যেমন নিদ্রায় কাটাইয়াছেন এইখানেও নিদ্রাসুখ ভোগ করেন আর প্রাতে দান পাওয়ার বেলায় সমান। শুধু তাহা নহে, দেশক যদি তরুণ ভিক্ষু হন ; তাঁহার দান হইতে অন্য সাধারণ তরুণ ভিক্ষুর সমান আর শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ মহাস্থবিরের দানীয় বস্তু হইবে বেশী ইহাও একটি কারণ যে কারণে শাস্ত্রানভিজ্ঞ ভিক্ষুরা ধর্মে জ্ঞানী হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন না। এই সমাজে জ্ঞানের ও গুণের মর্যাদা নাই মর্যাদা বয়সের। বয়স লাভ করিতে কিন্তু সাধনার প্রয়োজন হয় না ; তাহা প্রকৃতিগত। যেই সমাজ জ্ঞান ও গুণের মর্যাদা বুঝে না সেই সমাজে জ্ঞানী ও গুণী উৎপন্ন হইবে কিরূপে? ইহার ফল এই হইয়াছে যে-যে ক্ষেত্রে প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একজন শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুর দরকার সে ক্ষেত্রে দশ পনর গ্রাম মিলাইয়াও তেমন একজন ভিক্ষু পাওয়া যাইতেছে না। সমাজ শিক্ষিত ভিক্ষু লাভে বঞ্চিত হইবার অন্য একটা কারণ এই যে-সমাজের এই অজ্ঞানতা দেখিয়া কোন বড়লোকের ছেলে কোন শিক্ষিত যুবক এবং প্রৌঢ় প্রব্রজিত হন না।

বড়ুয়া সমাজ জ্ঞান ও গুণের সম্মান মর্যাদা দিতে জানেনা

কেহ হয়ত মনে করিতে পারে শিক্ষিত ভিক্ষুরা কি লাভ-সৎকারের জন্যই ভিক্ষু হইয়াছেন এবং লাভ-সৎকারের জন্য ধর্মদেশনা করিয়া থাকেন? ইহা সত্য যে ঐ জন্য কেহ ভিক্ষু হন না এবং ধর্ম্ম দেশকেরা ধর্ম্মদেশনা করেন না, তথাপি লাভ সৎকার ও মান সম্মানের প্রয়োজনীয়তা আছে, নাই এমন নহে। জ্ঞানী মাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। তাই অতীতে যেমন এই প্রথা ছিল বর্তমানেও বার্মা প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশে এই সৎপ্রথা বিদ্যমান। কেহ মনে করিতে পারে বয়স্ক ভিক্ষুরাই ত কনিষ্ঠ ভিক্ষুদের দ্বারা পূজ্য। ইহা সত্য যে জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণ কর্তৃক নমস্কার ও অগ্রাসনাদি লাভের যোগ্য তাই বলিয়া তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে মান সম্মান ও লাভ সৎকারাদি কনিষ্ঠগণ হইতে বেশী পাইবেন ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। একজন সাধারণ পিয়ন পিতা ম্যাজিষ্ট্রেট

সন্তানের পূজ্য বলিয়া সকল ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তান হইতে পিয়ন পিতার মান সম্মান মাহিনা এলাউন্সাদি লাভ সৎকার বেশী হইতে পারে না।

কাহারও নিকট প্রশ্ন আসিতে পারে-যেই দান যজ্ঞে কয়েকজন পণ্ডিত ভিক্ষু বর্তমান সেইখানে ধর্মপূজা কিরূপে করিতে হইবে? দায়ক যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ধর্মপূজা করিতে ইচ্ছা করেন উনি কনিষ্ঠ ভিক্ষু বা শ্রামণ হইলেও তাঁহার দ্বারাই ঐ দানানুষ্ঠানে ধর্ম্মদেশনাদি যাবতীয় কাজ সম্পাদন করাইয়া ধর্মপূজার সংজ্ঞায় তাঁহাকেই দান দিবেন। এই প্রথা সমাজে প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিলে প্রথমে নানা গণ্ডগোল সৃষ্টি হইবে। সমাজ হইতে অজ্ঞানতা দূর হইলে ইহা প্রবর্তিত হইয়া যাইবে যে কোন নূতন কিছু সমাজে প্রবর্তন করিতে সমাজে গণ্ডগোল উঠেই, ইহা চিরন্তন সত্য। সমাজে গণ্ডগোল উঠিবে বলিয়া সমাজে মঙ্গলময় প্রথা প্রচলন না করাও সমাজের পক্ষে মহাক্ষতি।

ধর্মপূজার প্রচলন ও সমাজে গণ্ডগোল

দায়ক

জগতে মানুষের উৎপত্তির পরে তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীল মনীষীরাও অনুভব করিতে পারিলেন যে মানবের উন্নতির জন্য ধর্মশিক্ষকের প্রয়োজন। কালক্রমে সমাজের প্রয়োজনানুসারে ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ধর্মযাজকেরা ধর্মের চর্চা ও সাধনা করিতেন এবং সময়ে ধর্মোপদেশ দিয়া গৃহীদিগকে পবিত্র ধর্ম পথে পরিচালিত করিতেন ও গৃহীদের পুণ্যানুষ্ঠানে সাহায্য করিতেন, গৃহীরা ও তাহাদের ধর্মগুরুকে আহারাদি প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়া সাহায্য করিতেন। এইভাবে বহু শতবৎসর ধরিয়া মানবসমাজ চলিয়া আসিতেছে। বড়ুয়া সমাজে ও ভিক্ষুরা গৃহীদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়া ও তাঁহাদের ধর্মকার্য্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। গৃহীরা-ও তাহাদের শক্তি ও শ্রদ্ধা অনুযায়ী ভিক্ষুদিগকে প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়া সেবা করিয়া আসিতেছেন।

ধর্মযাজকের প্রয়োজনীয়তা

বড়ুয়াদের অনেকে মনে করেন দায়ক শব্দের অর্থ গৃহী, আর কেহ কেহ মনে করেন যজমান। আসলে কিন্তু দায়ক শব্দের অর্থ তাহা নহে, দা+ণক প্রত্যয় করিয়া দায়ক শব্দের উৎপত্তি। দা দানে। অতএব দায়ক শব্দের অর্থ দাতা, গৃহী বা যজমান নহে। **সুমনা সুত্রে-সুমনাদেবী বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "দ্বে মে ভন্তে ভগবতো সাবকা, সমসদ্ধা সমসীলা, সমপঞ্ঞা, একো দায়কো একো আদায়কো কাযস্স ভেদা পরম্মরণা কিং তেসং নানা করণন্তি?"** প্রভু ভগবানের দুইজন শ্রাবক সমশ্রদ্ধা সম্পন্ন, সমশীলবান ও সমান প্রজ্ঞাবান ; একজন কিন্তু দায়ক অন্যজন অদায়ক, মৃত্যুর পর তাঁহাদের কোন পার্থক্য আছে কি? ইহাতে বুঝা গেল যে শুধু গৃহীরা দায়ক নয় ; যে ভিক্ষু দান দেন তিনিও দায়ক, শুধু দানের দ্বারাই পরিপূর্ণ দায়ক হওয়া যায় না ; পূর্ণ দায়ক হইতে হইলে যেমন দান দিতে হয় তেমন সেবা করিতে হয় এবং আপদে বিপদে রক্ষা করিতে হয়। যেমন যে ছেলে পড়ে তাহাকে পড়ুয়া-ছেলে বলা হয়। শুধু পড়িলেই পড়ুয়া ছেলের কর্তব্য শেষ হয় না। পরিপূর্ণ পড়ুয়া ছেলে হইতে হইলে তাহাকে পড়িতেও হইবে, লিখিতেও হইবে এবং বলিবার অভ্যাসও করিতে হইবে। যেমন বলা হইয়াছে-

দায়ক ও কৃত্য

"Reading maketh a full man, conference a ready man and writing an exact man." অর্থাৎ পঠনে মানুষ পূর্ণ হয়, কথনে প্রস্তুত বা প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন হয় এবং লিখায় খাঁটি হয়। তিনটি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই যথার্থ পড়ুয়া ছেলে হইতে হয়। সেইরূপ দানের দ্বারা, সেবার দ্বারা ও আপদে বিপদে রক্ষার দ্বারাই যথার্থ দায়ক হইতে হয়।

সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানাদি সম্পাদনের জন্য বড়ুয়ারা প্রায় গ্রামে অন্ততঃ একজন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাদের গ্রাম্য বিহারে বাস করান। যেই গ্রামে ভিক্ষু নাই সেই গ্রামবাসীও ভিন্ন গ্রাম হইতে ভিক্ষু আনাইয়া আপন আপন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করাইয়া থাকেন। এই প্রথা বহুবৎসর হইতে বড়ুয়া সমাজে চলিয়া আসিতেছে।

বড়ুয়া সমজে ভিক্ষু নিমন্ত্রণের কারণ

যাঁহারা ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন তাঁহারাই পালা করিয়া ভিক্ষুর প্রাতের ও দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর ভিক্ষুর অন্যান্য বস্তু যথা পান, তামাক, চা, চিনি প্রভৃতি না দিয়া উহার খরচ স্বরূপ বৎসরে ৭০ / ৮০ টাকা অথবা তদপেক্ষা কম বা বেশী দিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। সমাজে উহাকে "ওয়া খরচ" বলা হয়।

ভিক্ষুর আহারের ব্যবস্থা

যেই বিহারের এবং ভিক্ষুর অধীনে যেই সব গৃহী ধর্মানুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন সাধারণতঃ ঐসব গৃহীদিগকে ঐ বিহারের এবং ভিক্ষুর দায়ক বা থাগা বলা হয়। বস্তুতঃ দায়ক আর থাগা একই কথা। গৃহীরা মনে করেন ইহা আমাদের বিহার এবং ইনি আমাদের ধর্মগুরু। ভিক্ষুও মনে করেন এইসব গৃহী আমার দায়ক বা থাগা।

সমাজে প্রচলিত দায়ক বা থাগা

এমন বহু নিমন্ত্রণকারী দায়ক আছেন যাঁহাদের বাড়ীতে পালাক্রমে ছোয়াইং-এর কথা বলিতে গেলে নানা অজুহাত দেখাইয়া বলেন যে তাঁহারা পরদিন ছোয়াইং দিতে পারিবেন না। যিনি তাঁহাদের ধর্মগুরু তদুপরি নিমন্ত্রিত, সেই নিমন্ত্রিত ধর্মগুরুকে পরদিন একবেলা আহার দিতে স্বীকার করেন না ; অথচ সেই বাড়ীতে যদি

নিমন্ত্রিত ভিক্ষুদের প্রতি তথা কথিত দায়কের ব্যবহার

অনিমন্ত্রিত ৪/৫ জন আত্মীয় এমন কি সন্ধ্যার সময়ও আসেন তাঁহাদিগকে সেই রাত্রে দিতে পারিবেন না বলিয়া অস্বীকার করেন না। বরং তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট আহার দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে বিমুখ হন না। কোন কোন গ্রামে দেখা যায় ভিক্ষুর সেবক নিমন্ত্রণকারী পনর বিশ গৃহস্থকে অনুরোধ করার পর হয়তঃ কেহ ভিক্ষুর আহার দিবার জন্য স্বীকৃত হয়। নিমন্ত্রিত ধর্মগুরুকে যদি একবেলা আহারের জন্য নিমন্ত্রণকারী এক গৃহস্থের ঘরে ঘরে ঘুরিতে হয়, সেই ধর্মগুরুর আত্মমর্যাদাও থাকে কোথায়? আর তথাকথিত দায়কগণের ও আপনাদের ধর্মগুরুর প্রতি সম্মান গৌরব ও কর্তব্য জ্ঞান কোথায়? একজন চণ্ডাল ভিখারীও কি পনর বিশ ঘর ঘুরিলে কেহও কি তাহাকে একবেলা ভাত দেয় না? তথাকথিত নিমন্ত্রণকারী প্রত্যেক দায়ক পান তামাকাদির খরচ ভিক্ষুকে মাসিক দুই চারি আনা বা বার্ষিক আট আনা একটাকা করিয়া দিবেন বলিয়া যাহা তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়াছিলেন উহা যথা সময়ে ভিক্ষুকে দেওয়া হয় না। গ্রামের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহাকে যদি ভিক্ষু ঐ খরচের কথা বলেন তিনি প্রায় ক্ষেত্রে উত্তর দেন যে, তিনি কাজের জন্য অবকাশ পাইতেছেন না ; ভিক্ষু মহোদয় যেন প্রত্যেকের নিকট খুঁজিয়া নেন। ভিক্ষু খুঁজিলে কেহ কেহ দেন এবং কেহ কেহ দেন না। কোন কোন গ্রামে এমন মূর্খও কেহ কেহ থাকে যাহারা বলে যে-"ওয়া খরচ কিসের?" আমার ওয়ার জন্য ভিক্ষুকে চাকর রাখিয়াছি না কি?"

যাহারা ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি দেয় না, তাহারা কতই হীন,
চণ্ডাল হইতে অধম কতই নীচ, কতই অধম এবং কতই পাপী।
দায়ক

বুদ্ধ বসল সূত্রে বলিয়াছেন-

"যো বে পরকুলং গন্ত্বা ভুত্বান সুচি ভোজনং
আগতং ন পটিপূজেতি তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।"

অর্থাৎ যে পরের বাড়ীতে গিয়া সুচি উৎকৃষ্ট ভোজন ভোগ করে অথচ নিজের বাড়ীতে আসিলে তেমন দেয় না তাহাকে বসল বা চণ্ডাল বলিয়া জানিবে। আর যাহারা নিমন্ত্রণ করিয়া দেয় না তাহারা কি চণ্ডাল হইতেও অধম নয়? তাহারা কি তজ্জন্য মহাপাপ করে না? যেই সমাজে ধর্মগুরুর প্রতি

এমন হেয় ব্যবহার সেই সমাজ ধর্মের দিকে কতই হেয়, কতই নীচ এবং কতই অধম। যদি ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ না করা হয় তাহা হইলে কোন কথা উঠিতে পারে না। ভিক্ষুর ইচ্ছা হয় বিহারে থাকুক, ইচ্ছা না হয় অন্যত্র চলিয়া যাউক, ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করুক বা উপোস থাকুক, প্রব্রজ্যা ত্যাগ করুক বা অনাহারে মরিয়া যাউক তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না।

প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় বড়ুয়াদের মধ্যে যাঁহারা একটু অর্থ-বিত্ত সম্পন্ন তাঁহারা দায়ক হিসাবে দরিদ্র হইতে হীন। দরিদ্রেরা আপন আপন অবস্থানুযায়ী ভিক্ষুদিগকে যে পরিমাণ দান ও সেবা করিয়া থাকেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা সেই পরিমাণও করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ বা তদপেক্ষা বেশী করিলেও তাঁহাদের অবস্থানুপাতে তাঁহারা দরিদ্র হইতে দায়ক হিসাবে হীন। ক্বচিৎ যে ইহার ব্যতিক্রম নাই তেমন নহে। এমনও শুনা যায় কোন কোন গ্রামে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সর্বসাধারণ হইতে ছোয়াইং ও ওয়া খরচ একটু বেশী ধরিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন-"আমি কেন বেশী দিব, ভিক্ষু আমাকে শীলাদি বেশী দিবেন কি?" যেই সমাজে দরিদ্র ও অশিক্ষিতেরা দায়কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনী ও শিক্ষিতেরা দায়ক হিসাবে হীন, সেই সমাজে বড় লোকের ছেলে ও শিক্ষিত যুবকেরা প্রব্রজিত হইতে চাহিবে কেন? ইহাও একটি কারণ যেই কারণে সমাজে উপযুক্ত ভিক্ষু মিলিতেছে না এবং যেই জন্য সমাজ সমুন্নত হইতে পারিতেছে না।

ধনীরা দায়ক হিসাবে দরিদ্র হইতে হীন

কেহ যদি মনে করে যে ভিক্ষু দুঃশীল বা অজ্ঞ তাই শ্রদ্ধা হয় না এবং দিবার ইচ্ছা হয় না। নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ কথা বলা নিছক মুর্খতা মাত্র। যাহার নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে সে যদি মুচি, মেথর বা চোর বদমাইসকেও নিমন্ত্রণ করে ; সে নিমন্ত্রণ দিতে বাধ্য। এইখানে শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা বা ইচ্ছা অনিচ্ছার কথাই উঠিতে পারে না। নিমন্ত্রণ করার পূর্বেই সেই বিচার করা উচিত ছিল।

নিমন্ত্রিত ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা

কেহ যদি মনে করে যে আমরা আহারাদি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করি নাই ; ভিক্ষুদের ভিক্ষা করিয়াই খাওয়ার নিয়ম। আমরা আমাদের বিহারে থাকিবার জন্যই নিমন্ত্রণ করিয়াছি মাত্র। তাহাদের সেই ধারণা ভুল। কারণ বিহারে থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবার কোন গৃহীর অধিকার নাই। যে দায়ক

বা দায়কগণ বিহার নির্মাণ করিয়াছেন তিনি বা তাঁহারা কোন ভিক্ষুকে বা সংঘকে উহা দান করিয়াছেন। কোন ভিক্ষুকে দান দিলে উহা ঐ ভিক্ষুরই সম্পত্তি। আর সংঘকে দান দিলে উহা সংঘ-সম্পত্তি। দান শব্দের অর্থ ত্যাগ। বিক্রয় করিলে বিক্রয়-কারীর যেমন ঐ বস্তুর উপর কোন অধিকার থাকে না সেইরূপ দান করিলেও ঐ প্রদত্ত বস্তুর উপর দায়কের কোন অধিকার থাকে না। সাধারণতঃ চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত বিহারই সংঘ-সম্পত্তি। ঐ বিহারে বাস করিবার স্বনিকায়ের যে কোন ভিক্ষুর অধিকার বর্তমান। গৃহীদের আপন ঘরে বাসের অন্য জন্য কাহারও অনুরোধ করিবার যেমন অধিকার নাই, সেইরূপ ভিক্ষুদের বিহারে বাস করিবার জন্য ভিক্ষুদিগকে অনুরোধ বা নিমন্ত্রণ করিবার কোন গৃহী অধিকার নাই। যিনি বিহার নির্মাণ করিয়া দান দিয়াছেন তাঁহারও অধিকার নাই, অপরের কথাই বা কি?

বিহারে থাকিতে দিবার বা না দিবার অধিকার দায়কের নাই

চট্টগ্রামে ভিক্ষুরা তিন ভাগে বিভক্ত। বার্মা, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশেও ভিক্ষুরা নানা ভাগে বিভক্ত। চট্টগ্রামে ভিক্ষুদের ভাগ অনুযায়ী গৃহীরাও আপনাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত বলিয়া মনে করেন। কতকগুলি গৃহী মনে করেন তাঁহারা সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুদের দায়ক, আর কতকগুলি অন্যান্য নিকায়ের ভিক্ষুদের দায়ক। ভিক্ষুদের মধ্যে ভাগ আছে বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর 'ধর্মসম্ভোগ' ও 'আমিষসম্ভোগ' নাই। কিন্তু গৃহীদের মধ্যে ভাগ কোথায়? তাঁহাদের মধ্যে বিভাগ থাকিলে পরস্পরের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া বিবাহাদি কিরূপে হইতে পারে? অন্য দিকে দায়ক হিসাবেও ভাগ কোথায়? যাঁহারা সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুদের দায়ক মনে করেন তাঁহারা যদি শুধু ঐ নিকায়ের ভিক্ষুদিগকে দান দিতেন ও সেবা পূজা করিতেন এবং অন্য কোন নিকায়ের ভিক্ষু দিগকে দান ও সেবা-পূজা না করিতেন তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে ইহারা সংঘরাজ নিকায়ের দায়ক অন্য কোন নিকায়ের দায়ক নন। কর্মক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নহে। ঠিক সেইরূপ যাঁহারা নিজকে অন্য নিকায়ের ভিক্ষুদের দায়ক মনে করেন, তাঁহারা যদি শুধু ঐ নির্দিষ্ট নিকায়ের ভিক্ষুদের দান দিতেন ও সেবা-পূজা করিতেন অন্যান্য নিকায়ের ভিক্ষুদিগকে না করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের ধারণা সত্য হইত। কাজে যখন তাঁহারা তেমন করেন না তাঁহাদের ঐ ধারণাও মিথ্যা। দল, সমাজ বা জাতির দ্বারা কেহ দায়ক হয়

দায়ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হেতু গৃহীদের মধ্যে বিভেদের ভ্রান্ত ধারণা

না, কাজের দ্বারাই দায়ক হইতে হয়। "দানেন দায়কং জানন্তি" দানের দ্বারাই দায়কের পরিচয়। অতীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এমন কি অম্বপালী প্রভৃতি বেশ্যাগণও কি বুদ্ধ এবং ভিক্ষুদের দায়ক ছিলেন না?

সকলেই সকল ভিক্ষুর দায়ক

কার্যতঃ সকলেই সকল নিকায়ের ভিক্ষুদের দায়ক যিনি যেই ভিক্ষুকে যেই পরিমাণ দান ও সেবা পূজা করেন তিনি সেই ভিক্ষুর সেই পরিমাণ দায়ক মাত্র, তাহার চেয়ে বেশীও নয় এবং কমও নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভাগ না থাকিলেও ভাগ আছে এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হইয়া গৃহীরা নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কি অনর্থের সৃষ্টি করেন?

ভ্রান্ত ধারণায় সমাজের ক্ষতি

গ্রামে সামাজিক কোন গণ্ডগোল উৎপন্ন হইলে কতেক লোক একদল ছাড়িয়া অন্য দলে চলিয়া যায়। তাহাদের জ্ঞান নাই যে তাহারা কোনও দলে নাই এবং কোনও দলে যাইতে পারে না। যেই গ্রামে একটি বিহার রক্ষা করিবার মত শ্রদ্ধা ও সামর্থ্য নাই, এই অজ্ঞানতায় বশীভূত হইয়া সেই গ্রামে দুই তিনটি বিহার নির্মাণ করা হয়। এই বিহারের দ্বারা গ্রামবাসী যে দুই তিন ভাগে বিভক্ত হয় সেই ভাগ আর মিলান যায় না। এই অজ্ঞানতা হইতে সমাজে ধর্মের নামে বহু অধর্মই বর্ধিত হইতেছে।

দায়কের প্রকার ভেদ

দায়ককে সাধারণতঃ তাঁহাদের কার্যভেদে সাধারণ ও বিশিষ্ট হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। আবার উভয় প্রকার দায়কের প্রত্যেককে তাঁহাদের কর্মানুযায়ী উত্তম, মধ্যম ও অধম হিসাবে ভাগ করা যাইতে পারে।

সাধারণ দায়ক

যাঁহারা ভিক্ষুর প্রয়োজনে নয়, কেবল নিজের প্রয়োজনে দান দেন ও সেবা করেন তাঁহাদিগকে সাধারণ দায়ক বলা যাইতে পারে। নিজের প্রয়োজনে অর্থ মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধাদিতে দান দেওয়া ও সেবা করা এবং কোন নূতন বা ভাল জিনিষ পাইলে ভিক্ষুকে দান দেওয়া ও সেবা করা। ঐ সব দানে ভিক্ষু উপকৃত হন না তেমন নয় ইহাতে নিজের কার্যই প্রধানতঃ সাধন করা হয়। ঐ সব দান না হইলে ভিক্ষুর কোন অসুবিধা হয় না বলিয়া ঐরূপ দায়কও সকলে সমান নয়। এইসব দায়কের মধ্যে যাঁহার দান ও সেবা উত্তম তাহাকে উত্তম, যাঁহার মধ্যম তাঁহাকে মধ্যম এবং যাঁহার

অধম তাঁহাকে অধম দায়ক বলা যাইতে পারে।

যিনি বা যাঁহারা ভিক্ষুকে চর্তুপ্রত্যয় দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়মিত চর্তুপ্রত্যয় দান দেন, সেবা করেন এবং আপদে-বিপদে রক্ষা করেন তিনি বা তাঁহারাই বিশিষ্ট দায়ক। তিনি বা তাঁহারাই ভিক্ষুকে রক্ষা করিতেছেন। এই বিশিষ্ট দায়কেরাই প্রকৃত দায়ক নামের যোগ্য। তিনি বা তাঁহারা ভিক্ষুকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই অন্যেরা শীল গ্রহণ ও ধর্ম শ্রবণ করিয়া এবং সাধারণ দায়ক হিসাবে কাজ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিতেছেন। বিশিষ্ট দায়কের অভাবে গ্রামে ভিক্ষুর অভাব হয়। বড়ুয়া সমাজে ভিক্ষুর স্বল্পতা হেতু, ভিক্ষুর অভাবে ভিক্ষুকে অবলম্বন করিয়া গ্রামবাসীরা যেই সব কুশল কাজ করেন, সেই সব কুশল কাজ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সাধারণ দায়কও কেহ হইতে পারে না। অতএব বিশিষ্ট দায়কের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব কিরূপ, জ্ঞানী মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

বিশিষ্ট দায়ক

বিশিষ্ট দায়ক ও তাঁহাদের কর্মানুযায়ী নানা স্তরের। যেমন কেহ যদি কোন ভিক্ষুকে কেবলমাত্র দৈনিক একপোয়া করিয়া দুধ দিবেন বলিয়া এক বৎসরের জন্য নিমন্ত্রণ করেন ঐ ব্যক্তি সেই ভিক্ষুর দৈনিক এক পোয়া হিসাবে এক বৎসরের দুধের দায়ক মাত্র, অন্য কিছুর দায়ক নহেন। সেই এক বৎসর অতীত হইলে তিনি আর সেই দায়ক থাকিবেন না। সেইরূপ যিনি যেই বস্তু যতদিন যেই ভিক্ষুকে দিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করেন তিনি সেই ভিক্ষুর সেই বস্তুর ততদিনের দায়ক মাত্র। যেমন যেই ছেলে যতদিন যেই স্কুলে পড়ে ততদিন সেই স্কুলের ছাত্র মাত্র। স্কুল ছাড়িয়া হাল-চাষ করিলে তাহাকে আর স্কুল-ছাত্র বলা যায় না। কোন অফিসার যখন অফিস ত্যাগ করিয়া ব্যবসায় করেন তখন আর তাঁহাকে অফিসার বলা চলে না। সেইরূপ যেই স্ত্রী বা পুরুষ যতদিন যেইরূপ দায়কের কাজ করেন ততদিন সেইরূপ দায়ক মাত্র। তাহার চেয়ে বেশী বা কম নয়।

বিশিষ্ট দায়কের শ্রেণী ভাগ

কোন স্ত্রী বা পুরুষ যদি দায়ক হইতে ইচ্ছা করে, দায়ক গ্রহণের সময় ভিক্ষুর সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। দায়ক হইতে আকাঙ্ক্ষী স্ত্রী বা পুরুষকে দায়কের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তবেই দায়ক গ্রহণ করা উচিত। কারণ হীন ব্যক্তিকে দায়কের সম্মান, দায়কের গৌরব ও দায়কের শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা উচিত নয়। যে যে স্তরের দায়ক হওয়ার উপযোগী

দায়ক গ্রহণে সাবধানতা

তাহাকেই সেই স্তরের দায়ক করিলে উভয়েরই মঙ্গল হয়, নতুবা উভয়কেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অফিসে কেরাণী নিযুক্ত করিতে, ক্লাসে ছাত্র ঢুকাইতে এবং চাষা চাকর রাখিতেও ভালমন্দ বিচার করিয়া গ্রহণ করে। যে ক্ষেত্রে ভালমন্দ বিচার নাই অর্থাৎ জ্ঞান নাই সেই ক্ষেত্রে উভয়কেই দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং মনোমালিন্য হইয়া মঙ্গল হইতে বেশী অমঙ্গল হয়।

যে-কোন স্ত্রী বা পুরুষ দায়ক হইতে পারে না। দায়ক হইতে হইলে বিত্ত-সম্পত্তি অপেক্ষাও চিত্ত-সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা বেশী। ধনী, শিক্ষিত, বলবান বা পরিবার সম্পন্ন হইলেই দায়ক করা যাইতে পারে না। ধনী বা

দায়ক হইবার অধিকারী

দরিদ্র হউক, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হউক, সবল বা দুর্বল হউক, যেই দলের যেই সমাজের, যেই দেশের বা যেই জাতির হউক না কেন যে পুরুষ বা স্ত্রীর দান দিবার ও সেবা করিবার প্রবল শ্রদ্ধা ও অবকাশ আছে তাঁহাকে মাত্র দায়ক করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এই ভাবে ভাগ করিলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইবে, সমাজের একতা নষ্ট হইবে ; অতএব সমাজের

ভেদজ্ঞানে সমাজের অমঙ্গল ধারণা

অবনতি হইবে, উচ্চ নীচ, ছোট বড় ভেদাভেদ না করিয়া সকলকে সমদৃষ্টিতে সমানভাবে দেখিলেই সমাজে একতা বিরাজ করিবে এবং সমাজের মঙ্গল হইবে। সমদৃষ্টি উন্নতিবর্ধক ও মহত্ত্বব্যঞ্জক।

আমি মনে করি ভেদাভেদ জ্ঞানের অভাবেই সমাজে একতা প্রতিষ্ঠিত ও সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। **"পঞ্ঞা হি সেট্‌ঠা কুসলা বদন্তি।"** প্রজ্ঞাই সর্বশ্রেষ্ঠ কুশল বলিয়া কথিত। প্রজ্ঞা বা জ্ঞান যেখানে, সেখানে সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও বিভাজনাদি থাকেই। জ্ঞানের কাজ হইতেছে

সমদৃষ্টি

যাহা যেমন তাহাকে ঠিক তেমন ভাবে দেখা। মানুষেরা "নানত্তকায়া, নানত্তসঞ্ঞা।" ইহ ও জন্মান্তরের কর্ম বা সংস্কারের পার্থক্য হেতু মানুষের মধ্যে নানা প্রকারের পার্থক্য বর্তমান। সেই জন্য বুদ্ধ মানুষকে নানাভাবে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। যে স্থলে নানা প্রকারের পার্থক্য বিদ্যমান সে স্থলে সকলকে সমান মনে করা নিছক অজ্ঞানতা

মাত্র। এই অজ্ঞানতাই সকল প্রকার অবনতি ও দুঃখের মূল। অতএব ভেদাভেদ না করিয়া সমদৃষ্টিতে সকলকে সমানভাবে দেখাই অজ্ঞানতা এবং সকল প্রকার অবনতি ও দুঃখের কারণ। যেই জ্ঞানগৃহে (বিদ্যালয়ে) প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীর ছাত্র আছে, সকলে যখন ছাত্র সমদৃষ্টিতে সকলকে সমান মনে করিয়া শিক্ষক মহোদয়গণ যদি শ্রেণী ভাগ না করিয়া সকলকে একসঙ্গে একই বিষয় শিক্ষা দেন তাহাতে কি স্কুল বা ছাত্রদের উন্নতি হইবে-না অবনতি? প্রশ্ন হইতে পারে, তবে বড় বড় পণ্ডিতেরা সাম্যের এত প্রশংসা করেন কেন? সাম্য অর্থ সমদৃষ্টি বা সকলকে সমানভাবে দেখা নয় কি? সাম্য অর্থ সমদৃষ্টিই। কিন্তু সাম্য বা সমদৃষ্টি অর্থ সকলকে সমানভাবে দেখা নহে। এইখানে সম অর্থ সমান নহে, সম্যক। সমদৃষ্টি অর্থ সম্যকদৃষ্টি-সকলকে সম্যক প্রকারে দেখা। অর্থাৎ যে যেইরূপ তাহাকে ঠিক সেইভাবে দেখা। সমদৃষ্টির অন্য প্রতিশব্দ প্রজ্ঞা।

দায়কের জীবন ধন্য

শুনিয়াছি বার্মা প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশে একজন ভিক্ষুরও যদি কেহ চর্তুপ্রত্যয়ের দায়ক হইতে পারে তবে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করে। এমন কি একজন দরিদ্র গৃহী ও যে কোন ভিক্ষুর অন্ততঃ এক প্রত্যয়েরও দায়ক হইতে ইচ্ছা করে। তাই ঐ সব দেশে ভিক্ষুদের দায়কের অভাব নাই বলিয়া ভিক্ষুদিগকে যে-কোন প্রত্যয় বা বস্তু জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। বহু কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ, যেই কারণে ঐ সব দেশে ভিক্ষুর সংখ্যা বেশী।

বার্মা দেশের দায়ক (শুনাকথা)

শুনিয়াছি মৌলমেইনে একজন জমিদার একাই একটি বিহারের দায়ক। তাঁহার প্রদত্ত বিহারে শ্রামণ ও ছেলে ব্যতীত ৭০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। তিনি একাই ঐ ৭০০ ভিক্ষুর বিশিষ্ট দায়ক ছিলেন। শ্রামণ ও ছেলে ব্যতীত ১২ জন যুবক ঐ ভিক্ষু-সংঘের সেবার জন্য তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষ ১ম উদাহরণ

১৯৩৬ ইংরেজীতে আমি যখন আকিয়াব পোত্তলি মহাশ্মশানে কয়েকটি ধুতাঙ্গ-ব্রত পূর্ণ করিয়া ভিক্ষা করিয়া মাত্র একবেলা আহারের দ্বারা ভিক্ষু-ধর্ম পালন করিতেছিলাম, সেইখানে দেখিয়াছি প্রায় শ্মশা-বিহারে রামুবাসী একজন বড়ুয়ার ছেলে ভিক্ষুদের সেবক হিসাবে নিযুক্ত আছে। আমরা যখন প্রায় ৭টার সময় ভিক্ষার জন্য বাহির

হইতাম, সেই সময় ঐ সেবকগণও নিজ নিজ ভিক্ষুগণকে জলযোগাদি খাওয়ানোর পর আমাদের সঙ্গে ভিক্ষুদের দায়কদের বাড়ীতে গমন করিত এবং ভিক্ষু ও নিজের জন্য আহার নিয়া আসিত।

২য় উদাহরণ

ঐ সনের চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে ইটালিয়ান লোকনাথ ভিক্ষু রাত্রি প্রায় ৯টার সময় মোটরে আমার নিকট সেই শ্মশানে গিয়া আমাকে শহরের উত্তর পার্শ্বে হ্রেগুচু বিহারে নিয়া আসেন। সেই সময় রাঙ্গুনিয়ার সোনাইছরির বঙ্কিম তাঁহার সেবক ছিল। সেই বিহারে তখন ২১ জন ভিক্ষু-শ্রামণ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিন ভাই-ই বিহারবাসী ভিক্ষু-শ্রামণদের যাবতীয় প্রত্যয় বা বস্তু প্রদান করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিহারের ভিক্ষু ভিক্ষা করিলে তাঁহারা নাকি নিজেকে অপমানিত মনে করেন। ভিক্ষুদের সেবার জন্য শ্রামণ ও ছেলে ব্যতীত তাঁহারা দুইজন যুবক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

৩য় উদাহরণ

চৈত্র সংক্রান্তির দুইদিন পূর্বেই সেইখান হইতে আমরা মিউহং (পাথরকিল্লা) তঞ্জিতসু নামক অরণ্যাশ্রমে গমন করি। সেই গভীর অরণ্যাশ্রমে চৈত্রের ২৯, ৩০ তারিখ এবং ১লা বৈশাখ এই তিন দিন ধরিয়া প্রায় অর্ধ সহস্রাধিক নর নারী উপোসথশীল পালন করেন এবং ধর্মশ্রবণ ও ধর্মালোচনাদি পুণ্যকাজ সম্পাদন করেন। সেই উৎসবের পর লোকনাথ ভিক্ষু লঙ্কায় চলিয়া গেলেন। আমি, একজন বার্মা শ্রামণ ও চট্টগ্রামবাসী একজন হিন্দু শ্রামণ নিয়া সেইখানে বর্ষাবাস করি। আমরা সকলেই ধুতাঙ্গব্রত পালন করিতাম বলিয়া ভিক্ষা করিয়া মাত্র একবেলাই নিরামিষ আহার করিতাম। যাঁহারা আমাদের দায়ক ছিলেন তাঁহারা একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটি হইতেই আমাদের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ হইত। শুনিয়াছি কমিটির সদস্যগণ মাসিক ১ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতেন। তাঁহারা আমাদিগকে ভিক্ষা করিবার জন্য নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রাতেও যাগুআদি খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন ; আমরা কিন্তু ধুতাঙ্গব্রত পূরণ করিতেছিলাম বলিয়া ঐ ভাবেই জীবন যাপন করিতেছিলাম। আমাদের জন্য যেই সেবক নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহাকে মাসিক ৮ টাকা মাহিনা দিতে হইত। বিহারে একটি নিরামিষ তরকারী পাক করা হইত এবং আমাদের জন্য প্রতি দেড় সের দুধ ও তিন খানা করিয়া

বিলাতি বিস্কুট দেওয়া হইত। ঐ গুলিও আমাদিগকে ভিক্ষায় দেওয়া হইত। বার্মা শ্রামণটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন আমরা ভিক্ষা করিয়া মাত্র একবেলা আহার করিলেও তথাপি আমাদের জন্য মাসিক ২৯ / ৩০ টাকা ব্যয়িত হইত।

বিশুদ্ধিমার্গের শীল নির্দেশে একটি উপমা আছে-একজন তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া তাহা ভাবনা করিবার জন্য কোন প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামে একজন বিধবা তাহার একমাত্র মেয়েকে নিয়া কাঠ কাটিয়া জীবন যাপন করিত। এই তরুণ ভিক্ষুকে দেখিয়া সেই বিধবার পুত্রস্নেহ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই বিধবা তাহাদের নিকটবর্তী পাহাড়ে সেই ভিক্ষুর জন্য একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করাইয়া দিয়া প্রতিদিন তাহার বাড়ীতে আহার করিবার জন্য ঐ ভিক্ষুটিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। বিধবাটি প্রতিদিন প্রাতেঃ পান্থাভাত খাইয়া কাঠ কাটিতে যাইত। মেয়েটি আহার প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে ভিক্ষু আসিলে আহার করাইত। ভিক্ষু আহার করিয়া আশ্রমে চলিয়া যাইত। একদিন প্রাতে মা মেয়েকে বলিতেছিল-ঐ পাতিলে পরিষ্কার চাউল ঐ পাতিলে লোনা মাছ ও ঐ চুঙ্গীতে ঘি আছে তাহা তোমার দাদা ভিক্ষুর জন্য পাক করিও ; আর ঐ পাতিলে অপরিষ্কার চাউল ও ঐখানে শাক আছে তাহা আমাদের জন্য পাক করিও। ঐখানে লঙ্কা আছে তাহা পুড়িয়া চাট্‌নি করিও। বিশেষ কারণে সেইদিন ভিক্ষুটি সেই গ্রামে গিয়েছিলেন এবং দায়িকার ঐ আলাপ শুনিয়াছিলেন। উহা শুনিয়া ভিক্ষুটি চিন্তা করিলেন-আমি এই উপাসিকার কোন আত্মীয় নই এবং তাহার কোন উপকারও করিতেছি না ; তথাপি এই উপাসিকা আমার জন্যই উৎকৃষ্ট খাদ্যগুলি পাক করিবার জন্য বলিতেছে। পুণ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াই উপাসিকা এইরূপ করিতেছে। আমি অর্হৎ হইতে পারিলেই ইহার পুণ্য বেশী হইবে। এই চিন্তা করিয়া ভিক্ষুটি সেইখান হইতেই দৃঢ়তার সহিত কর্মস্থান ভাবনা করিলেন এবং আশ্রমে গিয়া অর্হৎ হইয়াই যথাসময়ে সেই বাড়ীতে আহার করিতে আসিয়াছিলেন। বর্ষবাসের পর ঐ ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট চলিয়া গিয়াছিলেন। মা ও মেয়ে রোদন করিতে করিতে ঐ ভিক্ষুকে বিদায় দিয়াছিলেন।

অতীতের উদাহরণ

বিশিষ্ট দায়ক ভিক্ষুকে প্রয়োজনীয় বস্তু দিবার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন

বলিয়া তাঁহাকে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। যিনি প্রতিদিন দেয়ায় বস্তুর দায়ক হন, তাঁহাকে প্রতিদিনই দান দিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় এবং ঐ বস্তু জোগাড় করিতে হয়। তাঁহার দান চেতনা প্রতিদিনই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহার 'চাগানুস্সতি' বা ত্যাগানুস্মৃতি ভাবিত হইয়া থাকে। তাঁহার দান চেতনার প্রবলতা হেতু মাৎসর্য ও ঈর্ষা প্রভৃতি পাপধর্ম তাঁহার লোপ পাইতে থাকে এবং মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা প্রভৃতি কুশল ধর্ম বর্ধিত হইতে থাকে। এইসব চেতনা বা কার্যের ফলে দায়ক ইহজীবনেই আনন্দ বহুল, শ্রদ্ধাবহুল ও পুণ্যবহুল হন। তিনি যে কোন সভা-সমিতিতে সম্মানিত ও পূজিত হন। তাঁহার লাভ সৎকার ইহজীবনেও বর্ধিত হয়।

বিশিষ্ট দায়কের ইহলৌকিক ফল

সাধক-ভিক্ষুর দায়কের এই গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা যে তিনি বা তাঁহারা মনে করিতে পারেন-আমি বা আমরা এই ভিক্ষুকে চর্তুপ্রত্যয় দিয়া রক্ষা করিতেছি বলিয়া সাধক ভিক্ষুর প্রভাবে যেই মঙ্গল হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে সেই সব মঙ্গল দেশের ও সমাজের হইতে পারিতেছে। আমি বা আমরা যদি এই ভিক্ষুর দায়ক হইয়া তাঁহাকে রক্ষা না করিতাম, তিনি হয়তঃ এখানে না থাকিয়া অন্য কোন প্রতিরূপ দেশে চলিয়া যাইতেন। তাহা হইলে এই দেশের লোকের এমন মঙ্গল হইত না ; অতএব সমাজে উক্ত মঙ্গলের মূলে আমি বা আমরাই। আমি বা আমরাই পরোক্ষভাবে মানব সমাজের এমন মহান মঙ্গল সাধন করিতেছি।

সাধক ভিক্ষুর দায়কের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব

প্রচারক বা দেশক ভিক্ষুর দায়ক হইলে দায়ক এই গৌরব অনুভব করিতে পারেন যে আমি বা আমরাই ভিক্ষু রাখিয়া মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিতেছি, মানুষের ইহজীবন ও জন্ম-জন্মান্তরের সর্ব প্রকার সুখ শান্তি বর্ধন করিতেছি কারণ জ্ঞানীরা বলেন, "ধর্মেন হীনা পশুভির্সমানা।" ধর্মহীন ব্যক্তি পশু সদৃশ। দেশক ভিক্ষুর দেশনা শুনিয়া অশ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধাবান হয়, কৃপণ দাতা, দুঃশীল শীলবান ও অজ্ঞানী জ্ঞানী হইয়া থাকে। ধর্ম শুনিয়াই মানুষ মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া সম্যকদৃষ্টি লাভ করে, সন্দেহ বিদূরিত করে, অশ্রুত বিষয় শুনে ; ছেলেমেয়েরা মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজন বর্গের সম্মান গৌরব করিতে জানে।

প্রচারক ভিক্ষুর দায়কের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব

ধর্ম শুনিয়াই আদর্শ জীবন, আদর্শ পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠিত হয়। ধর্ম শুনিয়াই মানুষ ধার্মিক হয়, সদ্‌গতি লাভ করে, মনুষ্য সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি, ব্রহ্ম সম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। দায়ক এই গৌরব অনুভব করিতে পারেন যে আমিই এই মানব সমাজের এই মহান মঙ্গলের মূলে বিদ্যমান। আমি বা আমরাই নানাদিকে সদ্ধর্মের বিস্তার ও স্থিতির কারণ।

শিক্ষক ভিক্ষুর দায়কের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব

শিক্ষক ভিক্ষুর দায়ক হইলে দায়কের এই গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা যে শিক্ষক ভিক্ষু হইতেই অন্যান্য ভিক্ষু-শ্রামণ শিক্ষা লাভ করিয়া কেহ সাধক, কেহ শিক্ষক, কেহ প্রচারক এবং কেহ সমাজ রক্ষক ভিক্ষু হইয়া থাকেন, এইসব ভিক্ষু-শ্রামণ দেব-মানবের যে বিপুল হিত করিয়া থাকেন এই সকল প্রকার হিতের মূলে আমি বা আমরা।

সমাজ রক্ষক ভিক্ষুর দায়কের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব

সমাজ রক্ষক ভিক্ষুর দায়কের এই গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা যে এই দায়কের সাহায্যেই সেই গ্রামবাসী ও ভিন্ন গ্রামবাসী মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। তাঁহার ও তাঁহাদের করুণাতেই মানুষেরা শীলাদি গ্রহণ ও পালন করিয়া সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানাদি সমাধান করতঃ জন্ম-জন্মান্তরের মঙ্গলের হেতু পুণ্য-সম্পদ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

দায়কের জন্ম-জন্মান্তরের ফল

বুদ্ধ বহু সূত্রে নানাভাবে দানের নানা প্রকার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকেই সেই বিষয়ে কিছু না কিছু অবগত আছেন, তাই এইখানে সেই বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখিলাম না। বুদ্ধ এক সূত্রে বলিয়াছেন- **"দানং খলু সভাবেন সগ্‌গমানুস ভোগদং পরিণাম বসেনেব হোতি মোক্‌খস্‌সুপনিস্‌সয়ং।"** দায়ক মৃত্যুর পরে তাঁহার দান ও সেবা কর্মের ফলে দেবলোকে নতুবা মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হন। তিনি দরিদ্র ও হীন না হইয়া মহাধনী ও ভোগশালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সুন্দর সুগঠিত উত্তম দেহ লোভ করেন। মৈত্রী-করুণাদির বৃদ্ধি হেতু কখনও পরিবার-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন না। মাৎসর্যহীন দায়কের যে বিপুল ফল বুদ্ধ নানা স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন এই বিশিষ্ট দায়ক তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকেন। এই পুণ্যবান ব্যক্তি এই কর্মকেই উপনিশ্রয় করিয়াই বিশাখা ও অনাথপিণ্ডিকের মত ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া অন্তিমে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

বিহার দায়ক

এই বিহারে সুখে অবস্থান করিয়া এই ভিক্ষু বা ভিক্ষুসঙ্ঘ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পূর্ণতা সাধন করুক এবং দেশী-বিদেশী গৃহীরাও দান, শীল এবং ভাবনাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা সকল সুখের হেতু পুণ্য সঞ্চয় করুক এই মনে করিয়া কোন ধার্মিক গৃহী বা গৃহীগণ বিহার নির্মাণ করতঃ সঙ্ঘকে বা কোন একজন ভিক্ষুকে দান করিয়া থাকেন। যেই ভিক্ষুকে দান দেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যই উহার উত্তরাধিকারী। যদি তাঁহার শিষ্য না থাকে তবে উহা সঙ্ঘেরই সম্পত্তি। প্রদত্ত বস্তুর উপর দায়কের কোন অধিকার থাকিতে পারে না। যে অধিকার আছে বলিয়া মনে করে সে দায়ক বা দাতাই নয়। যে দায়ক নয় সে দায়কের পুণ্য, দায়কের সম্মান, দায়কের গৌরব ও দায়কের শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে কিরূপে? বিহারের পরিপূর্ণ দায়ক হইতে হইলে বিহারের সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা কিছু ভিক্ষু-সংঘের দরকার তাহা প্রদান করিতে হইবে। তিনি "আরামরোপা, বনরোপা" হইবেন অর্থাৎ পুষ্পারাম, ফলারাম ও সুন্দর গাছপালা রোপণ করাইয়া বিহারকে সুন্দর ছায়া-সম্পন্ন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সর্বদিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তুলিবেন। এই সব কাজের দ্বারাই পরিপূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ দায়ক হওয়া যায়।

বিহার দায়ক

সর্বদিক পরিপূর্ণ করিয়া বিহার সঙ্ঘকে দান দিয়া দায়ক যদি মনে করেন যে আমার আর বিহারের প্রতি কোন করণীয় নাই, এখন উহা সঙ্ঘ সম্পত্তিই, সঙ্ঘ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। তাহা হইলে তিনি শ্রেষ্ঠ সাধারণ দায়ক মাত্র। যিনি যে পরিমাণ করেন সে-পরিমাণ দায়ক মাত্র তাহার চেয়ে বেশী বা কম নহেন।

সাধারণ বিহার দায়ক

বিশিষ্ট দায়ক হইতে হইলে ভিক্ষুগণ বিহার জনিত যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ না করেন তাঁহাকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেশী বিদেশী গৃহীরা যাহাতে সুখে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে সেই দিকেও নজর রাখিতে হইবে। যথা সময়ে জীর্ণ-সংস্কারাদি ও ঘেরাবেড়াদি প্রদান করিতে হইবে। ভিক্ষুর অনিষ্টকারী কেহ যেন অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বিহারে প্রবেশ না করে, বিহারের গাছপালা

বিশিষ্ট বিহার দায়ক

কেহ যেন কাটিতে না পারে, ফল যেন কেহ হরণ করিতে না পারে, বিহারের গাছ হইতে যেন পাখী, পুকুর হইতে যেন মাছ কেহ না মারিতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সব কাজের দ্বারাই বিশিষ্ট দায়ক হইতে হয়। বিহার দান করিয়া ঐ সব কাজ না করিলে সেই দায়ককে বিশিষ্ট দায়ক বলা যাইতে পারে না। বিহারের মূল দায়ক ব্যতীত ও যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ এই সব কাজ করেন তিনিই বিশিষ্ট দায়ক, যিনি যেই পরিমাণ বিশিষ্ট দায়কের কাজ করেন তিনি সেই পরিমাণ বিশিষ্ট দায়ক, তাহার চেয়ে বেশী বা কম নহেন এবং যতদিন করেন ততদিন মাত্র, তাহার পরে নহেন।

বৈশালীর বৃজিদিগকে বুদ্ধ যে সপ্ত অপরিহানীয় বা উন্নতিমূলক ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন যাহা পালন করিয়া সেই সময়ে পার্শ্ববর্তী সর্বজাতি হইতে তাঁহারা সর্ববিষয়ে সমুন্নত হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একটি এই-"যাঁহারা অর্হৎ প্রভৃতি শীলবান সৎ পুরুষদিগকে ধর্মতঃ রক্ষা করেন, অনাগত সৎপুরুষগণ যাহাতে দেশে আসেন তাহার চেষ্টা করেন এবং আগত সৎপুরুষগণ যাহাতে সুখে বাস করেন সেইদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখেন তাঁহাদের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইতে পারে না।" বিশিষ্ট দায়কগণ উপরি উক্ত কাজ সম্পাদন করেন বলিয়া দেশের উন্নতির কারণ হন। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে দেশকে সমুন্নত করিয়া থাকেন।

বিশিষ্ট দায়ক কর্তৃক দেশের উন্নতি সাধন

অর্থ কথা ও টীকায় উক্ত হইয়াছে-'যাহারা অনাগত সুশীল প্রব্রজিতগণের আগমন আকাঙ্ক্ষা করে না, আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্‌গমন করে না, বিহারে গিয়া তত্ত্বাবধান করে না, কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করে না, ধর্মালাপ করে না, ধর্ম শ্রবণ করে না, বিহার এবং বিহারের আসবাব-পত্রাদি মেরামত করাইয়া দেয় না, দান দেয় না, অনুমোদন শ্রবণ করে না, তাহারা ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন। তাহাদের এইরূপ অকীর্তি ঘোষিত হয় যে-এই দেশবাসীরা ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন ও অধার্মিক।

বিশিষ্ট দায়কের অভাবে গ্রামবাসীর দুর্নাম

এই দুর্নাম শ্রবণ করিয়া অনাগত শীলবান প্রব্রজিতগণ সেইখানে আসেন না। যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাও অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যান। সেই স্থানে ক্রমে প্রব্রজিত শূন্য হইয়া পড়ে। প্রব্রজিত শূন্য স্থানের রক্ষাকারী দেবগণও

প্রব্রজিত শূন্য স্থানের অমঙ্গল

রক্ষায় মনোযোগী হন না। অমনুষ্যেরাই ঐ স্থানে অবকাশ পায়। অমনুষ্য অধিকৃত স্থানে অনুৎপন্ন ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন ব্যাধি স্থায়ী হয় এবং নানা প্রকারের উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

শীলবানদিগের আগমনে, তাঁহাদিগকে মৈত্রীচক্ষে দর্শনে, তাহাদিগের নিকট ধর্মাদি শ্রবণ এবং তাহাদিগকে দানাদি প্রদানে পুণ্য সঞ্চিত হয়। সেই

দেবগণ কর্তৃক দায়কদিগের অমঙ্গল

পুণ্য দেবতাদিগকে দান দেওয়া হয়। রক্ষাকারী দেবগণ পুণ্যাংশ পাইয়া প্রীত হন এবং পুণ্যাবানদিগকে সুখে রক্ষা করেন। দেবগণ রোগাদির উপদ্রব উৎপন্ন হইতে দেন না এবং উৎপন্ন উপদ্রবাদিও বিদূরীত করেন, উৎপন্ন সুখ বর্ধিত ও স্থায়ী করেন এবং মামলা মকর্দমাদি বিষয়েও তাঁহারা সহায় হন। যেই বিশিষ্ট দায়কগণ শীলবান প্রব্রজিতকে ধর্মতঃ রক্ষা করেন, এই ভাবে তাঁহাদিগের মঙ্গলই হইয়া থাকে, অমঙ্গল হয় না।

এই বড়ুয়া-সমাজে এমন বহু অজ্ঞ ব্যক্তি আছে যাহারা মনে করে যে যেই পিতা বিহার দান করিয়াছেন তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা বিহারের কোন কাজ না করিলেও এমন কি বিহার সম্পত্তি হরণ করিয়া মহাপাপ করিলেও তাহার বিহার দায়ক। এই অজ্ঞানতার দ্বারাই চট্টগ্রামের কোনও গ্রামে একটিও

বিহার-দায়ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও গ্রামের ক্ষতি

উপযুক্ত বিহার প্রস্তুত হইয়া যথাধর্ম সুরক্ষিত হইতেছে না। অথচ এক এক গ্রামে কয়েকটি নিম্নস্তরের বিহার নির্মিত হইয়া গ্রামের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছে। এই সব ব্যক্তিরা একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিত যে শিক্ষকের ছেলে শিক্ষকতা না করিলে যেমন তাহাকে শিক্ষক বলা চলে না, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তারী না করিলে তাহাকে যেমন ডাক্তার বলা যায় না সেইরূপ দায়কের ছেলে যদি দায়কের কাজ না করে তাহাকেও তেমন দায়ক বলা যায় না। বিহার সম্পত্তি সঙ্ঘ-সম্পত্তিই। এই সম্পত্তি যে হরণ করে সে সঙ্ঘ-সম্পত্তি হরণকারী মহাচোর-মহাপাপীই। এই সত্য জ্ঞানের অভাবেই চট্টগ্রামে যাহারা বিহার-দায়ক বলিয়া কথিত তাহাদের প্রায় সকলেই বিহার-সম্পত্তি হরণ করিয়া মহাপাপ করিতেছে এবং সেই পাপের ফলে সেই বিহার দায়কদের অবনতি ও বিনাশ হইতেছে। সাধারণতঃ গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই

বিহার নির্মাণ করাইয়া দান দিয়া থাকেন। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিহার দান দেওয়ার পর এক পুরুষেই বিহার দায়কের বাড়ী ধ্বংস হইয়া যায়। যাঁহারা বিশেষ পুণ্যবান তাঁহাদের বাড়ী ক্বচিৎ দেড় পুরুষ বা দুই পুরুষ পর্যন্ত টিকে। এই দুর্দশা এই চট্টগ্রামের অজ্ঞ বিহার-দায়কদেরই হয়, বৌদ্ধ-প্রধান দেশের বিজ্ঞ বিহার-দায়কদের হয় না। এই ধ্বংস পাপের ফলে হয়-না পুণ্যের ফলে? চট্টগ্রামের বিহার দায়কেরা পুণ্য করিতে গিয়া জ্ঞানের অভাবে পাপই করিয়া থাকে বেশী। যেই পাপের ফলে ইহজীবনে এতই তীব্র, ভবিষ্যৎ জন্ম-জন্মান্তরের কতই ভীষণ হইবে, আমার মনে হয়, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ব্যতীত কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না ; এমন মনে হওয়ার কারণ পরে বলিতেছি।

বিহার-দায়ক বিহারকে অবলম্বন করিয়া কিরূপে মহাপাপ করেন? পট্‌ঠানে উক্ত হইয়াছে-**"কুসলং উপনিস্‌সায় অকুসলং পবড্‌ঢতি।"** অর্থাৎ কুশলকে উপনিশ্রয় করিয়া অকুশল প্রবর্ধিত হয়। যেই বিহার-দায়ক দিবারাত্রির যে কোন সময় বিহার দায়ক বলিয়া অহঙ্কার সমন্বিত চিন্তা করেন, বাক্য বলেন ও কার্য করেন ইহাতে সেই সেই সময়ই অকুশল উৎপন্ন ও বর্ধিত হইতে থাকে। চট্টগ্রামে প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যাহারা বিহার-দায়ক নয়, তাহারাই বিহার-দায়ক বলিয়া অহঙ্কার করে। শুধু তাহা নয়, যাহারা বিহার-সম্পত্তি হরণকারী মহাপাপী, তাহারাই বিহার-দায়ক বলিয়া নিজে এবং অপরেও মনে করে এবং অহঙ্কার সমন্বিত চিন্তা করে, বাক্য বলে এবং কার্য করিয়া অনন্ত পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

কিরূপে বিহার-দায়কের পাপ হয়

কিরূপে বিহার-সম্পত্তি হরণ করে? বিহার-দায়কের পুত্র-পৌত্রেরা মনে করে তাহারাই বিহার-দায়ক। বিহার তাহাদের অধিকারে। অতএব তাহারা বিহারের গাছ ও ফলাদি নিজস্ব মনে করিয়া হরণ করিয়া থাকে। পারাজিক পালিতে পাঁচটি চোরের কথা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্থ চোর এই-**"পুন চ পরং ভিক্‌খবে ভিক্ষু যানি তানি সঙ্ঘস্‌স গরুভণ্ডানি গরুপরিক্‌খারানি সেয্যথিদং আরামো আরামবত্থু বিহারো বিহারবত্থু মঞ্চোপীঠং ভিসি বিম্বোহনং লোহকুম্ভি লোহভাণকং লোহচারকো লোহকটাহো বাসি ফরসু কুঠারি কুদ্দালো নিখাদনং বল্লিবেলুমুঞ্জো বব্বজং তিণং মত্তিকা দারুভণ্ডং মত্তিকাভণ্ডং তেহি গিহী**

সঙ্গন্হাতি উপলাপেতি। অযং ভিক্খবে চতুত্থো মহাচোরো সন্তো সংবিজ্জমানো লোকস্মিং।" অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! পুনঃ পাপী-ভিক্ষু সঙ্ঘের যেই সব গুরুভাণ্ড, গুরুব্যবহার্য বস্তু যথা আরাম আরাম বস্তু, বিহার, বিহার বস্তু, মঞ্চপীঠ, বিছানা, বালিশ, লৌহ-কলসী, লৌহ চালনী, লৌহ পাত্র, লৌহ কড়াই, বাইস, কুড়ুল, কুটারী, কোদাল, খন্তা, বেত-বাঁশ, মুঞ্জঘাস, বর্বজঘাস, তৃণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠভাণ্ড, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতির দ্বারা গৃহীদিগকে সাহায্য করে ও প্রলোভিত করে, সে জগতে চতুর্থ চোর নামে অভিহিত। যেই ভিক্ষু গৃহাদিগকে সঙ্ঘের উক্ত বস্তু দ্বারা সাহায্য করেন তিনি যদি মহাচোর হন, আর যে বা যাহারা বিহারের সাঙ্ঘিক বস্তু হরণ করে সে বা তাহারা কি মহাচোর হইতেও শ্রেষ্ঠ চোর নহে? কোন কোন স্থলে দেখা যায় বিহার-দায়ক বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও নিত্য বুদ্ধ-প্রতিবার সেবা-পূজার জন্য কিছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা ঐ সম্পত্তি ভোগ করে ও সামান্যভাবে বুদ্ধ প্রতিমার সেবা-পূজা করিয়া থাকে মাত্র। হয়তঃ ছয়কানি জমি ভোগ করিয়া এক কানি জমির আয় ব্যয় করে, অন্য পাঁচ কানি জমি নিজে ভোগ করিয়া নিজেকে বিহার দায়ক মনে করিয়া থাকে। মানুষ যেমন টাকা দিয়া নিজের সেবার জন্য সেবক বা চাকর নিযুক্ত করিয়া থাকে, সেই চাকর সেই গৃহের অধিকারী নয়, টাকার জন্য যে চাকরী করিতেছে, সে চারক মাত্র। ঠিক সেইরূপ বিহার-দায়ক সম্পত্তি-ভোগকারীকে সম্পত্তি দিয়া সেবক বা চাকরই নিযুক্ত করিয়াছেন মাত্র। সে বিহার দায়কের নিযুক্ত চাকরই, দায়ক নয়। সেই সম্পত্তি মুচি-মেথর প্রভৃতি যে কাহাকেও দিলে সেও ঐ কাজ করিত। শুধু তাহা নয়, যদি অর্ধেক ভোগ করিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুর সেবার জন্য অর্ধেক ব্যয় করিতে বলিত, অর্ধেক খরচ করিয়াও সেই নীচ ব্যক্তি সেই কাজের ভার লইত। যেই ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সঙ্ঘ-সম্পত্তি বুদ্ধের ও আগন্তুক ভিক্ষুর জন্য মাত্র একগুণ খরচ করিয়া চারি পাঁচ গুণ কোন কোন ক্ষেত্রে আট দশ গুণ নিজে ভোগ করে তাহার বাহাদুরী কোথায়? তাহার চেয়ে একজন দুঃখী দরিদ্র বিধবা যদি বৎসরে একবারও নিজের খরচে বুদ্ধ বা আগন্তুক ভিক্ষুকে দান দেয় অথচ সঙ্ঘ-সম্পত্তি তৎপরিবর্তে ভোগ করে না ; সেই বিধবার দানই নিজস্ব দান, সে-ই ঐ নিযুক্ত সংঘ-সম্পত্তিভোগী দায়ক হইতে শ্রেষ্ঠ। সম্পত্তি বুদ্ধের নামে দান দিলেও তাহা সঙ্ঘেরই অধিকারভুক্ত। কারণ পিতার সম্পত্তিতে যেমন

বিহার-সম্পত্তি হরণ-কারী দায়ক নয়, চোর মাত্র

পুত্রের অধিকার বুদ্ধের সম্পত্তিতেও তেমন ভিক্ষুর অধিকার।

বিশিষ্ট বিহার-দায়ক বর্তমান জন্মের কর্মে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যবান এবং সকল মানুষের মহাহিতকারী। তিনি শুধু মানুষের হিতকারী তেমন নন, তিনি দেব-ব্রহ্মাদেরও হিতকারী। এই বিহারকে অবলম্বন করিয়া বহুবৎসরাবধি দলে দলে নর-নারী এবং দেব-ব্রহ্মা বুদ্ধপূজা, ধর্মপূজা ও সংঘপূজা করিয়া থাকেন। এই বিহারকে আশ্রয় করিয়াই দান-শীল ভাবনাদি বিবিধ প্রকারের কুশল পুণ্যার্থীদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সকল প্রকার পুণ্যার্থীদের পুণ্য সঞ্চয়ের মূলে বিশিষ্ট বিহার-দায়ক। তাঁহার অভাবে পুণ্যাকাঙ্ক্ষীরা উক্ত প্রকার পুণ্য করিতে পারে না। যেমন স্কুল প্রতিষ্ঠার অভাবে শিক্ষার্থীরা নান বিষয় শিক্ষা করিয়া জ্ঞানী হইতে পারে না, হস্‌পিটাল প্রতিষ্ঠাতার অভাবে রোগীরা চিকিৎসিত হইয়া রোগমুক্ত ও সুস্থ সবল হইতে পারে না, সেইরূপ বিহার-দায়কের অভাবে বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের মহাহিত সাধিত হইতে পারে না। সেই জন্যই বিশিষ্ট বিহার-দায়ক ইহজীবনে মহাপুণ্যবান এবং দরিদ্র হইলেও বর্তমান জন্মের কর্মে সকলের শ্রেষ্ঠ।

বিশিষ্ট বিহার দায়কের প্রত্যক্ষ ফল

বিহার দানের ফল বুদ্ধ নান সূত্রে বিবিধ প্রকারে অপ্রমেয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন বেনুবনদানানুমোদন সূত্রে বলিয়াছেন-

"বিহারদানস্‌স পনানিসংসং কো নাম বত্তুং পুরিসো সমত্থো
অঞ্ঞত্র বুদ্ধা পন লোকনাথা যুত্তো মুখানং নহুতেন চা'পি"।

বিহার দানের সুফল সর্বজ্ঞ বুদ্ধগণ ব্যতীত কেহ অযুতমুখে দেশনা করিতেও সক্ষম হইবে না। বিহার দানানুমোদন সুত্রে বলিয়াছেন- "বিহার দানং সঙ্ঘস্‌স অগ্‌গং বুদ্ধেন বন্নিতং"-সঙ্ঘকে বিহারদান অগ্র বলিয়া বলদান সূত্রে বলিয়াছেন-"সো চ সব্বদদো হোতি যো দদাতি উপস্‌সযং" যিনি উপশ্রয় বা বিহার দান করেন তিনি আয়ু, বর্ণ, সুখ, বলাদি সব কিছুই দান দিয়া থাকেন।

বিহার-দায়কের জন্মান্তরের ফল

নিচ্চ পুঞ্ঞবড্‌ঢক সুত্রে বুদ্ধ বলিয়াছেন-

"আরামরোপা বনরোপা যে জনা সেতুকারকা
পপঞ্চ উদপানঞ্চ যে দদন্তি উপস্‌সযং

তেসং দিবা চ রত্তো চ সদা পুঞ্ঞং পবড্ঢতি
ধম্মট্ঠা সীলসম্পন্না তে জনা সগ্গগামিনো।"

যাঁহার পুষ্পারাম, ফলারাম, ছায়াসম্পন্ন বন, সেতু, জলছত্র, জলাশয় এবং বিহার দান দেন তাঁহাদের দিবারাত্রি পুণ্য বর্ধিত হইয়া থাকে (দিবা রাত্রির মধ্যে যখন স্মরণ করেন তখন, অন্য সময় নয়) তাঁহারা ধর্মস্থ, শীলসম্পন্ন ও স্বর্গগামী।

বুদ্ধ বেলাম সূত্রে উপমা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে-"বেলাম নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সাত বৎসর সাত মাস নদীর স্রোত্রের মতই অন্নপানীয়, চুরাশি হাজার স্বর্ণপাত্র রৌপ্যপূর্ণ করিয়া, চুরাশি হাজার রৌপ্যপাত্র স্বর্ণপূর্ণ করিয়া, চুরাশি হাজার কাংস্যপাত্র হিরণ্যপূর্ণ করিয়া, চুরাশি হাজার হাতী স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণজাল ও স্বর্ণধ্বজায় সুসজ্জিত করিয়া, চুরাশি হাজার রথ সিংহচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, দীপিচর্ম, পাণ্ডুকম্বল পরিপূর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণজাল ও স্বর্ণধ্বজায় সুসজ্জিত করিয়া ; চুরাশি হাজার ধেনু বস্ত্রের আস্তরণ ও কাংস্য সরঞ্জামে সাজাইয়া, চুরাশি হাজার কুমারী মুক্তা-মণিতে সুসজ্জিত করিয়া ; চুরাশি হাজার উৎকৃষ্ট পালঙ্ক দুগ্ধফেননিভ আস্তরণ ও উভয় পার্শ্বে লোহিত বর্ণ উপাদান সহ এবং চুরাশি হাজার সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কোসেয়্য, কার্পাসবস্ত্র ও কম্বল প্রদান করিয়াছিলেন। বেলাম ব্রাহ্মণের এই বিপুল দান হইতেও একজন স্রোতাপন্নকে একবেলা আহার দানের ফল বেশী। একজন স্রোতাপন্নকে দানে যেই ফল একজন সকৃদাগামীকে দান তাহা হইতেও পুণ্য বেশী। এইরূপে অনাগামী, অর্হৎ ও প্রত্যেক বুদ্ধকে দানে ফল বেশী। একশত জন প্রত্যেক-বুদ্ধ হইতে একজন সম্যক-সম্বুদ্ধকে দানের ফল বেশী। সম্যকসম্বুদ্ধ অপেক্ষা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘদানের ফল বেশী, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘদান হইতেও সঙ্ঘকে একটি বিহার দানের ফল বেশী।" অর্থকথায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে বিহারটি ক্ষুদ্র হইলেও উহা যদি চৈত্যস্থানে করা হয়, ভিক্ষুরা ইচ্ছানুসারে উহা ব্যবহার করিতে পারেন তেমন বিহার দানেরও এমন বিপুল ফল হইয়া থাকে।

বেলাম সূত্রের আংশিক ব্যাখ্যা

বিহার দানে দায়কের পুণ্য যেমন অত্যন্ত বেশী, যাহারা বিহার সম্পত্তি হরণ করে তাহাদের পাপ কি তেমন অত্যন্ত বেশী হইবে না? কারণ "Action reaction are equal." ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমান।

গ্রাম্য-সমাজ

বড়ুয়াদের অনুন্নতির যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি আমার মনে হয় গ্রাম্য সমাজের প্রায় সমাজ-নেতাদের সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। সম-✓অজ্+ঘঞ্ প্রত্যয়ে সমাজ শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং সম-✓ই+ক্তি প্রত্যয়ে সমিতি। উভয় শব্দের সম উপসর্গ এবং ✓অজ ও ✓ই ধাতু গমনে। অতএব উভয় শব্দের উপসর্গ ও ধাতু যখন সমান, উভয় শব্দের অর্থও সমান। একই সঙ্গে কাজ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ার নামই সমাজ বা সমিতি। একটি সমিতি গঠন করিলে তাহার একটি উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের কয়েকটি উপায় থাকে এবং সেই উপয়ের উপকারী নিয়মাবলী থাকে। কিন্তু এক একটি বড়ুয়া গ্রামে যে-কয়েকটি সমাজ থাকে সেই সমাজের যেই কোন সমাজ নেতাকে জিজ্ঞাসা করিলে "কোন সমাজের কি উদ্দেশ্য? উপায় এবং নিয়মাবলীই বা কি কি?" কেহই কিছুতে বলিতে পারিবেন না। সেই জন্যই বলা যায় যে সমাজ-নেতারা সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই জন্যই সমাজ নিয়া গ্রামে বাদ-বিবাদ, ভাগ-বিভাগ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন অন্ধেরা হাতী দেখিতে গিয়া এক একজন এক এক মত প্রকাশ করে। ফলে ঝগড়া ও মারামারি সৃষ্টি হয়। সন্ধান করিলে জানা যায় যে কোন গ্রাম্য-সমাজের উদ্দেশ্য সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতি, ধনোন্নতি, জ্ঞানোন্নতি, ধর্মোন্নতি নহে। কেহ হয়তঃ বলিবেন গ্রামে বিবাহাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনই এই সমাজের উদ্দেশ্য। সত্যানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে তাহাও সমাজের উদ্দেশ্য নয়। কারণ এমন বহু বিবাহাদি দেখা যায় সামাজিক লোককে বাদ দিয়া সম্পাদিত হইতেছে, তবে এই সব সমাজের ঠিক উদ্দেশ্য কি? অনুসন্ধানে যাহা পাওয়া যায়, যথাসত্য বলিতে গেলে বলিতে হয় বরযাত্রী ও কনেযাত্রী প্রভৃতিকে "শিরায় বসাই" এই সব সমাজের উদ্দেশ্য। সংখ্যানুপাতে বড়ুয়ারা বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান হইতে শিক্ষায় উন্নত বলিয়া গৌরবও করে এবং সমাজ-নেতারা এক একজন বিশেষ ধরণের বিজ্ঞ বলিয়া গর্বানুভব ত করেন-ই। শিরায় বসিবার জন্য যাহারা সমাজ গঠন করে, গ্রামের অন্য কোন প্রকার মঙ্গলের জন্য নয় সেই সমাজের অজ্ঞানতার বিষয় চিন্তা করিলে সাধারণ বিচারশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরও হাসি পায়, বিজ্ঞদের কথাই বা কি?

গ্রাম্য সমাজ ও উদ্দেশ্য

বুদ্ধের ধর্ম জ্ঞান-প্রধান। যে যেইরূপ কাজ করিবে সে সেইরূপ ফল পাইবে, **"কম্মং সত্তে বিভজিত যদিদং হীনপ্পনীততায়"**-কর্মই প্রাণীদিগকে শ্রেষ্ঠ ও হীন করিয়া বিভাগ করিয়া থাকে, ইহাই বুদ্ধবাক্য। শ্রেষ্ঠ হইবার কাজ না করিয়া অজ্ঞানীরা চায় শিরায় বসিয়াই শ্রেষ্ঠ হইতে। কেহ মনে করে আমার পিতা-পিতামহ শিরায় বসিয়াছিল অতএব শিরা আমারাই প্রাপ্য। আর কেহ মনে করে আমি কুলীন বা উচ্চ শিক্ষিত বা উচ্চ পদস্থ অতএব শিরা আমারই প্রাপ্য ইত্যাদি। এই শিরায় বসা নিয়াই প্রায় গ্রামে বাদ-বিবাদ ও ভেদাভেদের সৃষ্টি। যাহাদের জ্ঞান নাই, যাহারা উপযুক্ততার সম্মান দিতে জানে না, তাহাদের এমন হওয়াত স্বাভাবিকই। শিরায় বসিয়া শ্রেষ্ঠতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা হইতে শ্রেষ্ঠ আহাম্মুকি বৌদ্ধদের পক্ষে আর কি হইতে পারে?

শিরায় বসিয়া শ্রেষ্ঠতা-অর্জন

বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী। বৌদ্ধ বুদ্ধের শিষ্য বা জ্ঞানের সাধক। জ্ঞানের সাধক বা বুদ্ধের শিষ্য হইলে এমন হীন ধারণা অন্তরে পোষণ করিয়া মানুষের এমন অশান্তি ও গ্রামের এমন অনর্থ কেহই সৃষ্টি করিতে পারিবে না। বৌদ্ধেরা বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু-সঙ্ঘ হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া শিরায় বসিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই সঙ্ঘে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, পণ্ডিত ও মূর্খ এবং শীলবান ও দুঃশীল বিদ্যমান। কিন্তু ইহাদের আসন গ্রহণে কোন গণ্ডগোল নাই। বুদ্ধের নির্দেশ মত যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই শিরায় বসেন এবং অন্য সব বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমনিম্নে বসেন। ইহাতে নিম্নে বসিয়াছেন বলিয়া কুলীনের কুলীনত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এবং শীলবানের শীলত্ব নষ্ট হয় না। বুদ্ধের নির্দেশ মত গৃহীরাও সঙ্ঘের আদর্শ গ্রহণ করিয়া বয়ঃক্রমানুসারে বসিলে ঐ সম্বন্ধে সমস্ত গণ্ডগোল মিলিয়া যায়। "একজন চাকর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাকেও কি শিরায় বসাইতে হইবে?" এই প্রশ্ন কেহ হয়তঃ করিতে পারেন। চাকরকে শিরায় বসাইতে হইবে না। শ্রামণ বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও যেমন ভিক্ষুর নীচে বসে সেইরূপ এইখানেও বসিতে পারে।

সঙ্ঘের আদর্শ গ্রহণ

বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি অতীতে গ্রাম্য সমাজগুলির কিছু সার্থকতা ছিল। বিবাহাদি কাজ সম্পাদনের জন্যই ঐ সমাজ গঠিত হইত। বিবাহাদি যেই কোন ব্যাপারে সামাজিক লোকেরা লাক্‌ড়ি

অতীত ও বর্তমান সমাজ

তৈয়ার করা, পত্রকাটা প্রভৃতি ঐ ব্যাপারের সমস্ত কাজই করিয়া দিত। এখন সেইসব কাজ সামাজিক ব্যক্তিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। তাহারাও তাহা আপনাদের একান্ত করণীয় বলিয়া মনে করে না।

তথাকথিত সমাজ-নেতারা গ্রামের অর্থোন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, জ্ঞানোন্নতি ও ধর্মোন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করিতে দেখা যায় না। তাঁহাদের কাজ জোটে যখন সামাজিক কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রণ নামে। সমাজনেতাদের তখন আদেশ হয় উহাকে ডাকিতে পারিবে না বা উহার বাড়ীতে খাইতে পারিবে না ইত্যাদি। ইহাতে তাঁহাদের অনেকেরই মহাপাপ হইয়া থাকে, কথা বলিতে জানেন না বলিয়া। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নিরপেক্ষভাবে কথা বলিতে জানিলে তজ্জন্য পাপ হইত না। আমি নিজেই দেখিয়াছি কোন কোন সমাজনেতা তীব্র দ্বেষ-চিত্ত নিয়াই ঐরূপ আদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ আদেশ দ্বারা নিমন্ত্রণ-দায়কের পুণ্যের অন্তরায় হয় এবং প্রতিগ্রাহকের লাভের অন্তরায় হয়, এই উভয় অন্তরায় করিয়া নিজেই পাপ সঞ্চয় করতঃ এইসব অজ্ঞ ব্যক্তি নিজের পায়েই কুড়ুল মারেন মাত্র।

সমাজ নেতাদের পাপকর্ম

গ্রামে যদি কেহ কোন দোষাবহ কাজ করে, যেমন মাতা, পিতা, বড় ভাই প্রভৃতি পূজনীয় কোন ব্যক্তিকে অপমান করে বা আঘাত করে, তিনি যদি শালিসি বিচার-প্রার্থী হন, বিচারকেরা বিবাদীকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিলে দোষীকে শাস্তি দেন যে তাহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে অথবা জরিমানা দিতে হইবে। যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা না করে বা জরিমানা না দেয় তাহা হইলে সে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সমাজ হইতে পতিত থাকে। অপরাধের লঘু-গুরু ভেদাভেদানুযায়ী জরিমানা ব্যতীত কোন শাস্তির তারতম্য নাই। কয়েক বৎসর পতিত থাকিয়াও অপরাধী যদি সমাজে মিশিতে চায়, "ক্ষমা চাওয়া" যাহার শাস্তি তাহাকে পুনঃ ক্ষমাই চাহিতে হইবে। যাহাকে যে-পরিমাণ জরিমানা করা হইয়াছিল তাহাকে পুনঃ সেই পরিমাণ জরিমানাই দিতে হইবে। এইভাবের বিচার ও শাস্তি-দানের মধ্যে জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে কি? সমাজে পতিত থাকা শাস্তি নয় কি? বহুক্ষেত্রে দেখা যায় বিচারকদের লঘু-গুরু অপরাধের ভেদাভেদ নাই। একজন বড় ভাইকে হয়তঃ একটু অপমান করিয়াছে বিচারকদের আদেশে

সমাজ নেতাদের অজ্ঞানতাপূর্ণ বিচার ও শাস্তি

সে ক্ষমা না চাহিলে সে যেমন অনির্দিষ্ট কাজের জন্য সমাজে পতিত, আর যে মাকে আঘাত করিয়াছে সেও তেমন। বিচারকদের এই অজ্ঞতা হেতু বিচারকদের যে শাস্তি হয়, কয়জন বিচারক বা সমাজ নেতার সেই জ্ঞান আছে? কি ভাবের শাস্তি? লঘু অপরাধের যেই ব্যক্তি পতিত দুই এক বৎসর পরে তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহাকে নিয়াই সমাজের কাজ করে। সমাজনেতা বা বিচারকদের তখন তাহারা তোয়াক্কাই রাখে না। যেই বিচারক বা সমাজনেতার আত্মমর্যাদা জ্ঞান নাই তাঁহারা এই শাস্তির কথা বুঝিতে পারেন না। সমাজ-নেতাদের এই অজ্ঞানতার কারণেও সমাজে একতা তিষ্ঠেনা-সমাজে শাসন চলে না।

সাধারণতঃ যাহাকে সমাজে পতিত করা হয় কোন নিমন্ত্রণে সমাজ নেতাগণ তাহাকে ডাকিতে দেন না। উহাকে না ডাকাই উহার প্রধান শাস্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে না ডাকাই প্রধান শাস্তি নয় ; ডাকিয়া একসঙ্গে না খাইলেই, তাহাকে পৃথক খাওয়াইলেই প্রকৃত পক্ষে তাহাকে শ্রেষ্ঠ শাস্তি দেওয়া হয়। ইহাতে নিজের এবং সমাজের মঙ্গল হয়। নিজের মঙ্গল হয় তাঁহাদের কাহাকেও নিমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য নিষেধ করিতে হয় না। নিষেধ করিলে যে পাপ হয় সেই পাপ হইতে তাঁহারা মুক্ত থাকেন। তাঁহাদের অমতে অপরাধীকে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অপমান করা হয় সেই অপমানই হইতেও রক্ষা পান। ইহাতে পার্টির সৃষ্টি হইয়া সমাজের একতাও নষ্ট হইতে পারে না।

জ্ঞান পূর্ণ শাস্তি ও নিজেদের অব্যাহতি

কোন কোন গ্রামে সমাজ-নেতারা গ্রামের ভিক্ষুর দ্বারা গ্রামের কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াইয়া থাকেন। ভিক্ষুও না বুঝিয়া তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন। ইহাতে ভিক্ষু এবং গ্রাম উভয়েরই অমঙ্গল হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও মৌলভী স্থায়ীভাবে একস্থানে থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সামাজিক শাসন চলিতে পারে। ভিক্ষুরা সন্ন্যাসী এবং অস্থায়ী বলিয়া ভিক্ষুকে অবলম্বন করিয়া সামাজিক শাসন চলিতে পারেনা। সেই জন্যই যেই ভিক্ষু সামাজিক শাসনে যোগ দিয়াছেন তাঁহাকে প্রায় ক্ষেত্রেই অপমানিত ও অপদস্থ হইতে হইয়াছে এবং প্রায়ক্ষেত্রে সেই বিহার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ভিক্ষুরা ধর্মানুশাসন করিবেন, রক্ষা করা

ভিক্ষুদ্বারা সমাজ শাসন

না করা গৃহীদের ইচ্ছা। রক্ষা করিলে তাহাদের মঙ্গল, না করিলে অমঙ্গল। সামাজিক শাসন রাজশাসনের অন্তর্গত। উহা ভিক্ষুকে বাদ দিয়া গ্রামের প্রধানরাই করিবেন।

সমাজ সম্বন্ধে সমাজের নেতা বা সামাজিক লোকদিগের যদি এই সত্য ধারণা থাকিত যে তাহাদের সমাজ "শিরায় বসিবার সমাজ" অন্য কিছুর জন্য নয় ; তাহা হইলে গ্রামের যে কোন মঙ্গলজনক কাজে সমাজের অজুহাত দেখাইয়া কেহও অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিত না। সকলে সম্মিলিতভাবে ঐ কাজ সম্পাদন করিয়া গ্রামের নানাদিকে মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারিত। সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই গ্রামের অন্যতর অবনতির কারণ।

সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে গ্রামের অবনতি।

নিমন্ত্রণাদি সম্পাদনের জন্য সমাজের প্রয়োজন নাই এমন বলিতেছি না। উহা সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না বলিতেছি মাত্র। হাঁড়ি, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি অশিক্ষিত ও নীচ জাতের মধ্যে এবং কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্যদের মধ্যেও বিবাহাদি ও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। ঐ নিমন্ত্রণাদি সম্পাদনের জন্য তাহাদেরও সমাজ আছে। শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া যাঁহারা গৌরব অনুভব করেন তাঁহারাও যদি ঐ প্রকার সমাজ নিয়াই তুষ্ট রহিলেন তাহা হইলে তাঁহাদের ও উপরি উক্ত লোকদের মধ্যে আর পার্থক্য কোথায়?

অশিক্ষিত ও অসভ্যদের সমাজ

প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা নিজকে শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহাদের আবাস স্থান গ্রামকে নানা বিষয়ে সমুন্নত করিতে হইবে। গ্রামের মঙ্গল সাধন করিতে হইলে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রত্যেক গ্রামে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়া কয়েকটি সমাজ বা সমিতি গঠন করিতে হইবে। ইহাতে বিভেদের সৃষ্টি হইয়া একতার অভাব হইবে এবং তজ্জন্য গ্রামের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া কেহ কেহ হয়তঃ ভয়ে আঁত্‌কিয়া উঠিবেন। কিন্তু ইহাতে ভয়ের কারণ নাই। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কয়েকটি সমাজ গঠিত হইলে জ্ঞান থাকিলে বিভেদের সৃষ্টি ও একতার পরিহানি হয় না, বরং একতা সুদৃঢ় হয়। যেমন কিশোরেরা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, সমাজ বা সমিতি গঠন করিতে পারে। ছাত্রেরা

নানা প্রকার সমাজের প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞানোন্নতির জন্য, অন্যেরা ধর্মোন্নতি এবং অপরেরা অর্থোন্নতির জন্য সমাজ গঠন করিতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি চতুর্বিধ উন্নতিই চায় তাহা হইলে সে চতুর্বিধ সমাজের সদস্য হইতে পারে। এইভাবে গ্রামের কিশোর যুবক ও প্রৌঢ়েরা এবং মাতৃজাতিরাও যদি প্রত্যেক গ্রামে কয়েকটি সমাজ গঠন করিয়া, আত্মোন্নতি ও সমাজোন্নতির জন্যে খাটেন তাহা হইলে সেই গ্রাম অবিলম্বেই উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে। গ্রামবাসীও সকলে সর্ববিষয়ে সুখী হইবে।

-সমাপ্ত-

বই প্রকাশের জন্য শ্রদ্ধাদান দাতাগণের নামের তালিকা ঃ

নাম ও ঠিকানা	টাকার পরিমাণ
১। **ভদন্ত শান্তি ভদ্র থেরো** অধ্যক্ষ, রত্নাঙ্কুর বিহার সাতবাড়িয়া বেপারী পাড়া, চন্দনাইশ	৫০০.০০
২। **ভদন্ত ধর্মবংশ ভিক্ষু** রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার	২০০.০০
৩। **ভদন্ত সুমনশ্রী ভিক্ষু** জোবরা সুগত বিহার, হাটহাজারী	১০০০.০০
৪। **ভদন্ত সুমন রক্ষিত ভিক্ষু** অধ্যক্ষ, সংঘরাজ অভয়তিষ্য বিহার চর বরমা, চন্দনাইশ	২০০.০০
৫। **বাবু পান্না লাল বড়ুয়া** স্বত্বাধিকারী, সামস্ ইন্টারন্যাশনাল শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ।	২০০০.০০
৬। **শ্রীমতি প্রীতি রাণী বড়ুয়া** বরদা মহাজনের বাড়ী পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান।	১০০০.০০
৭। **বাবু শাক্য কুমার বড়ুয়া** (উচ্চমান সহকারী (অবঃ) কে. পি. এম) বরদা মহাজনের বাড়ী পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান।	২০০.০০
৮। **বাবু ডালিম বড়ুয়া** পিতা-মৃত খগেন্দ্র লাল বড়ুয়া ঘাটচেক, রাঙ্গুনীয়া।	৩০০.০০

নাম ও ঠিকানা	টাকার পরিমাণ
৯। **বাবু সত্যজিত বড়ুয়া** পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান।	১০০.০০
১০। **বাবু দীপংকর বড়ুয়া** বাথুয়া, পটিয়া।	৫০০.০০
১১। **শ্রীমতি প্রিয়বালা বড়ুয়া** বরদা মহাজনের বাড়ী পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান।	৫০০.০০
১২। **বাবু বংকিম বড়ুয়া** পশ্চিম আধার মানিক, উত্তর গুজরা, রাউজান।	৫০০.০০
১৩। **বাবু সুধীর বড়ুয়া** খামার বাড়ী, কদলপুর, রাউজান।	৫০০.০০
১৪। **শ্রীমতি সানু বালা বড়ুয়া** আবদুল্লাপুর, ফটিকছড়ি।	২০১.০০
১৫। **শ্রীমতি জ্যোতি বড়ুয়া** আবদুল্লাপুর, ফটিকছড়ি।	১০১.০০
১৬। **শ্রীমতি স্বপ্না বড়ুয়া** হোয়ারপাড়া, রাউজান।	৫০.০০
১৭। **মায়া বড়ুয়া** পাঁচরিয়া, পটিয়া।	৫০.০০

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনীয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

বই এর নাম	লেখকের নাম	মূল্য
(১) আনন্দলোকে	আনন্দমিত্র মহাথের	৩৫.০০ টাকা
(২, ৩) অমৃতের সন্ধান ও সত্য-সাধনা	আনন্দমিত্র মহাথের	৩৫.০০ টাকা
(৪) ত্রিরত্ন পূজা ও সূত্র সংগ্রহ	ভিক্খু বিপুল বংশ	৩০.০০ টাকা
(৫) মহৎ জীবন ত্রিপিটক বাগীশ্বর আনন্দমিত্র	অনিল কান্তি বড়ুয়া	৩০.০০ টাকা
(৬) প্রবন্ধ সংকলন (প্রথম খণ্ড)	ভিক্ষু বিপুল বংশ	
(যৌথ সম্পাদনা)	অনিল কান্তি বড়ুয়া	৬০.০০ টাকা
(৭) আলোকিত জীবন সুধর্মানন্দ	অনিল কান্তি বড়ুয়া	৪০.০০ টাকা
(৮) আমার সমাজ	আনন্দমিত্র মহাস্থবির	.....

পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় ঃ

(১) প্রবন্ধ সংকলন (২য় খণ্ড)	ভিক্ষু বিপুল বংশ
(২) বুদ্ধের দৃষ্টিতে সাম্য ও মৈত্রী	ভিক্ষু বিপুল বংশ